স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ২৪ ডিসেম্বর - ২০১২।। ৮ পৌষ - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

মোদী চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন □ ৯

তৃণমূল কোন পথে? □ ১০

খোলা চিঠি : ঘাসফুলে বেশ শীত পড়েছে □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

তথ্য-প্রযুক্তি আইনের ৬৬ অনুচ্ছেদ :
কেন বিতর্কিত? □ তারক সাহা □ ১২

ক্যাগ নিয়ে মন্ত্রীর বিষোদ্গার গণতন্ত্রকে
নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস □ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১৪

ক্যাগের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ দেউলিয়া □ দেবব্রত চৌধুরী □ ১৬

ভারতরত্ন রবিশঙ্কর □ রমাপ্রসাদ দত্ত □ ১৮

ভাবনা-চিন্তা : মূল্যায়ন □ প্রীতিমাধব রায় □ ২০

বিবেকানন্দের জন্মের দেড়শো বছরে চলুন কন্যাকুমারী □ ২১

যজুর্বেদের কথা □ রবীন সেনগুপ্ত □ ২২

সামবেদের প্রচার ও প্রসার □ ২৩

যীশুপুজোয় মহিলাদের ভূমিকা □ মিতা রায় □ ২৬

দীর্ঘ বিশ বছর পরেও সত্য আলো
দেখলো না □ ডঃ সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী □ ২৭

মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় শহীদদের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের
কথা ভাবেনি বাংলাদেশ □ ২৯

সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবনে সংস্কৃতভারতী □ দীনেশ কামত □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □
পুস্তক-প্রসঙ্গ : ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬ □ □ রঙ্গম : ৩৯
□ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ৮ পৌষ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ২৪ ডিসেম্বর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সরকারি রোষানলে অডিট রিপোর্ট
পৃঃ ১৪-১৭

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬
হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয় :

গুজরাটে নরেন্দ্র মোদীর হ্যাটট্রিক

উন্নয়নের জোয়ারে গুজরাটকে ভাসিয়ে পরপর তিনবার মুখ্যমন্ত্রীর আসনে নরেন্দ্র মোদী। দেশজুড়ে আর্থিক মন্দার মধ্যেও গুজরাটে চোখে পড়ার মতো আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির কারণে গুজরাটবাসীর কাছে নরেন্দ্র মোদী হয়ে উঠেছেন চোখের মণি। নানা দিক থেকে এবারের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেছেন **ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ, অমলেশ মিশ্র প্রমুখ।**

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।

HB®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

গরীব কাহারে কয় ?

মাসে ছয়শত টাকা পাইলেই পাঁচ জনের একটি পরিবার স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। ছয়শত টাকায় যে পরিমাণ চাল ডাল ময়দা কিনিতে পারা যায় তাহাতে পাঁচজনের একটি পরিবারের প্রয়োজন সহজেই মিটিয়া যাইবে। সম্প্রতি দিল্লীতে অন্নশ্রী যোজনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করিয়াছেন দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত। ইহাতেই প্রমাণিত হয় দিল্লীর জনগণ আসলে কেমন রহিয়াছে এই মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে। যিনি বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের খবর রাখিতে পারেন না তিনি রাজত্ব চালাইতেছেন কিভাবে তাহা সহজেই অনুমেয় এবং তাঁহার রাজত্বে জনগণ কোন দুর্দশায় রহিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল পাঁচজনের পরিবারে চাল, ডাল, চিনি, ময়দা ছয়-সাত টাকায় মাসকাবারি চলে? বিজেপি নেতা মুকতার আব্বাস নাকভি সেই জন্যই বলিয়াছেন, একশো বছর পূর্বে ছয়শত টাকায় মাস চালানো যাইত কিন্তু এখন ওই টাকায় একবেলার খাবার পাওয়াও মুশকিল। এই ধরনের যোজনা করিয়া কংগ্রেস আসলে সাধারণ মানুষকে অপমান করিতেছে। আসলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী মাথাপিছু নিত্য খাওয়া খরচ বাবদ চার টাকা ধরিয়াছেন। কংগ্রেসী রাজত্বে চার টাকায় কোন্ স্থানে খাবার পাওয়া যাইতে পারে? এই ভাবে রাজনৈতিক ভাঁওতাবাজি না করিয়া কংগ্রেসের উচিত দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি রোধ করা। ইহার পূর্বে যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়াও এরকম ভাঁওতাবাজি কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন আম-আদমির প্রত্যহ শহরাঞ্চলে ৩২ টাকা ও গ্রামাঞ্চলে ২৬ টাকা জীবন ধারণ করিবার জন্য প্রয়োজন। বিচিত্র এই সংখ্যাতত্ত্ব আওড়াইয়া কংগ্রেস দেশ চালাইতেছে।

সাম্প্রতিককালে সমগ্র বিশ্বে পরিবর্তনের ঢেউ লক্ষ্য করা যাইতেছে। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও এর বিস্তার ঘটিয়াছে। বর্তমান সমাজজীবনে এই সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাইয়া শাসকদল রাজনীতি করিতেছে। এখনকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করিলে দেখা যাইতেছে, জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজন মতো সদর্থক ভূমিকা পালনে কিছু ঘাটতি থাকিয়া যাইতেছে। তাই জনগণ খুবই নিরাশায় ভুগিতেছেন। পূর্বকালের ব্যক্তিরা আদর্শ, নীতি, নিষ্ঠা, পুঁজি করিয়া রাজনীতির ময়দানে নামিতেন; কিন্তু আজিকার দিনে রাজনৈতিক বৃত্তে থাকা ব্যক্তিরা কেউ কেউ পরিবারের সদস্য হইবার সুবাদে রাজনীতির মঞ্চে আসিতেছেন। আজ রাজনীতির রসায়ন পুরোপুরি পালটাইয়া গিয়াছে। তাই মানবিক নীতি বর্জিত সুবিধাবাদী ব্যক্তিদেরই রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে বেশি লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাই এখনকার রাজনৈতিক নেতাদের মুখ এবং মনের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকিতেছে। মূল্যবোধের অভাব, সৎ ব্যক্তিত্বের সমাজে অনাদর প্রভৃতি কারণে আজ রাজনীতি অবক্ষয়ের দিকে চলিতেছে। নিঃশব্দে দুর্নীতির অনুপ্রবেশের ফলে সমগ্র সমাজজীবনই আজ বিধ্বস্ত। যদি বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা যেহেতু মানবিকমনস্ক নয় তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রতিটি নীতিই দুর্নীতিমুক্ত হইবার সুযোগ কম থাকে। যাহার জন্য আম-আদমির অধিকার সঠিকভাবে রক্ষিত হইতেছে না। জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ছয়শত টাকার রসায়ন ভাঁওতাবাজি বলিয়াই গণ্য হইতেছে। তবে গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী করিতে জনগণের হস্তেও কিছু ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সম্প্রতি লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'রাইটস টু রিকল'-এর পক্ষে সওয়াল করিয়াছেন যাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়টির অবতারণা করিয়া তিনি নতুন করিয়া বিতর্কের সূচনা করিয়াছেন। অধুনা কিছু জনপ্রতিনিধিদের ভাষা ও ভূমিকা আম-আদমির মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটাইয়াছে অথচ বিকল্পপন্থা লইবার সুযোগ নাই। একমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা ছাড়া। সেইজন্য জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজন মতো ফেরানোর অধিকার জনগণের হাতে থাকা উচিত বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে এইরূপ ভাঁওতাবাজি চলিতেই থাকিবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ওঠ, জাগো, সময় চলিয়া যাইতেছে, আর আমাদের সমুদয় শক্তি বৃথা বাক্যে ব্যয়িত হইতেছে। ওঠ, জাগো—সামান্য সামান্য বিষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত-মতান্তর লইয়া বৃথা বিবাদ পরিত্যাগ কর। তোমাদের সম্মুখে খুব বড় কাজ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমশঃ ডুবিতেছে, তাহাদের উদ্ধার কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রয়াত মাস্টারমশাই-এর স্মরণে স্মারিকা উন্মোচন। — ছবি : শিবু ঘোষ

মাতৃভূমির প্রতি অচলা ভক্তিই ছিল মাস্টারমশাইয়ের জীবন ব্রত : ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১১ ডিসেম্বর কলকাতার মহাজাতি সদনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের উপস্থিতিতে কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো। 'মাস্টারমশাই' নামে সুপরিচিত হাওড়া গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯১২-১৯৭৯) ছিলেন আর এস এসের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের প্রথম সঙ্ঘচালক। তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে গঠিত হয় 'কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি'।

বিগত এক বছর সমিতির উদ্যোগে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই (বিশেষত উত্তরবঙ্গ) মাস্টারমশাই-এর জন্মশতবর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে শ্রী ভাগবত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রিষড়া প্রেমমন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সেবিকা সমিতির বরিষ্ঠ কার্যকত্রী মহুয়া ধর, উদ্‌যাপন সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণব রক্ষিত প্রমুখ।

শ্রী ভাগবত তাঁর ভাষণে মাস্টারমশাই-এর জন্মশতবর্ষ 'উদ্‌যাপন'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ''এই অনুষ্ঠান 'সমাপন' কার্যক্রম নয়। আক্ষরিক অর্থেই উদ্‌যাপন কার্যক্রম। জীবনের 'ব্রত'-রই উদ্‌যাপন হতে পারে। মাতৃভূমির প্রতি অচলা ভক্তিই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত, তাঁর লেখা গান, কবিতা সবেতেই তার প্রকাশ ঘটেছে। তাই তিনি সবার কাছে অনুকরণীয়। যাঁরা দেখেছেন, যাঁরা দেখেননি এবং যাঁরা তাঁর কথা শুনেছেন তাঁদের কাছেও। তাঁর সমস্ত সদ্‌গুণ নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারলে সেটাই হবে তাঁর প্রতি সঠিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।'' নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথায় মোহনজী জানান, ১৯৭০ সালে বর্ধমানে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে ঘোষের (বাদ্য) শিক্ষক হিসেবে নাগপুর থেকে এসে মাস্টারমশাইকে তাঁর প্রথম দেখা। তাঁর মন্তব্য, 'কারুকে জীবনভর দেখলেও সবসময় তাঁর কথা মনে পড়ে না। আর কারুকে সাতদিন দেখলেও তাঁর কথা জীবনে ভোলা যায় না। মাস্টারমশাই ছিলেন এরকমই একজন মানুষ। তিনি অনুভবে চিরস্মরণীয়।'' মোহনজী আরও বলেন, ''বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্ঘচালকরা প্রত্যেকেই স্বনামধন্য। এঁর মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা ডাক নামেই প্রসিদ্ধ। যেমন রাজস্থানের সঙ্ঘচালক পরিচিত রয়েছেন 'কাকাজী' নামে তেমনই কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীরও মুখ্য পরিচয় ছিল 'মাস্টারমশাই' হিসেবে। এভাবেই তাঁরা স্বয়ংসেবকদের আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠেন।''

বিশ্বহিন্দু পরিষদের মার্গদর্শকমণ্ডলীর প্রধান দেবানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন 'মাস্টারমশাই'-এর প্রকৃত অর্থেই 'ছাত্র'। সেইসূত্রে 'মাস্টারমশাই'কে কাছ থেকে দেখার দুর্লভ অভিজ্ঞতা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে ভাগ করে নেন তিনি। তিনি বলেন, ''মাস্টারমশাই যে গান লিখেছিলেন, 'তোমার কাজে জীবন দিব', তা তাঁর জীবন দিয়েই প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। ছাত্র পড়ানো তাঁর পেশা ছিল না, ছিল জাতি গঠনে মানুষ তৈরির কারখানা। জরুরি অবস্থার সময় স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছেন। জেলের মধ্যে সঙ্ঘের শাখা করেছেন, কয়েদীদের পড়িয়েওছেন। তাঁর আদর্শ ব্যক্তি চরিত্রের পাশে আদর্শ রাষ্ট্রীয় চরিত্রও ছিল।'' অনুষ্ঠানের শুরুতে 'মাস্টারমশাই'-এর লেখা গানে নৃত্য পরিবেশন করে হাওড়া শিশুমন্দিরের কচি-কাঁচারা। পরে তাঁর লেখা সংস্কৃত কবিতা 'ভারত মাতহ দেহীবরম' আবৃত্তি করেন তাঁর পৌত্র শৌনক চক্রবর্তী। বিবেকানন্দের শতবর্ষে মাস্টারমশাই-এর লেখা শ্রদ্ধার্ঘ্য-গীতটি প্রায় অর্ধশতাব্দী পর পরিবেশন করেন বিকাশ ভট্টাচার্য। উদ্‌যাপন সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন প্রণব রক্ষিত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমিতির সভাপতি তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্ঘের সমমনস্ক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ওইদিন পুষ্পপ্রদান করে মাস্টারমশাই-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সংবাদ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে প্রকাশ্যে দিবালোকে মৌলবাদীদের হাতে খুন হিন্দু যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৯ ডিসেম্বর খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ ন্যাশানালিস্ট পার্টি ও জামাত-এ-ইসলামির ডাকা বনধে মুসলিম মৌলবাদীদের নৃশংসতার শিকার হলো এক হিন্দুযুবক। ২৪ বছরের ওই যুবকটির নাম বিশ্বজিৎ কুমার দাস, পেশায় একটি দরজির দোকানের (নাম : আমন্ত্রণ টেলার্স) মালিক। দোকানটি পুরনো ঢাকার শাঁখারিবাজারে অবস্থিত। ঘটনার দিন ঢাকা-আরিচা জাতীয় সড়কে বনধ চলাকালীন জাতীয়তাবাদী ছাত্র লীগ ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের সমর্থকরা বিনা প্ররোচনায় লোহার রড ও ধারালো খুর দিয়ে স্রেফ 'হিন্দু' হওয়ার অপরাধে কুপিয়ে হত্যা করে বিশ্বজিৎকে।

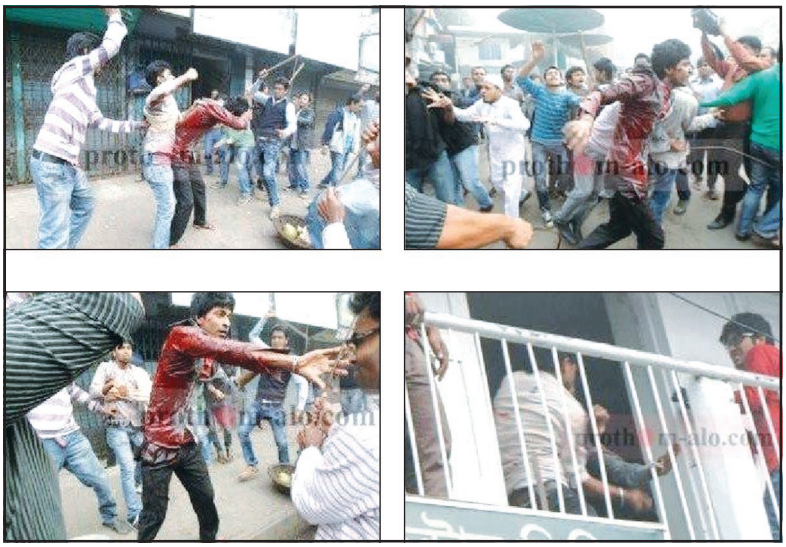

ঘটনার পর বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে এনিয়ে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং কয়েকটি নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যম এব্যাপারে নিন্দায় মুখর হলে বি এন পি-র তরফ থেকে বিশ্বজিৎ-কে তাদের বিরোধীপক্ষ অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের বলে দাবি করা হয়। কিন্তু বিশ্বজিৎ-এর পড়শিরা জানাচ্ছেন শান্ত প্রকৃতির ছেলেটি রাজনীতির ধারপাশও মাড়াতো না। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, বনধের সমর্থনে ঘটনার দিন সকালে বিএনপি-জামাতের সদস্যরা জজ কোর্ট চত্বরে উগ্র সাম্প্রদায়িক স্লোগান দিতে দিতে মিছিল করছিল।

অন্যদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের ইউনিটও তাদের সঙ্গে মিছিলে যোগদান করে গলা মেলায়। এমন সময় উন্মত্ত হয়ে তারা বোমা ছুঁড়তে থাকে বেপরোয়াভাবে ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে পেট্রোল পাম্পে। এরই মধ্যে এদের জনা পঁচিশেক সমর্থক বিশ্বজিৎকে আচমকা কোপাতে থাকে। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।

শুধু তাই নয়, গুরুতর আহত অবস্থায় বিশ্বজিৎকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার চেষ্টা হলেও উন্মত্ত মৌলবাদীরা সেখানেও তাকে ধাওয়া করে লোহার রড় ও ক্ষুর দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।

গুজরাটে নরেন্দ্র মোদীর হ্যাটট্রিক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এক্সিট পোলস-এর হিসেব ঠিক হলে গুজরাটে নরেন্দ্র মোদী হ্যাটট্রিক করতে চলেছেন। এইবারের গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনে মোদী দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতছেন। চারটি এক্সিট পোলের হিসেবে দেখা যাচ্ছে গুজরাট বিধানসভার ১৮২টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১১৮ থেকে ১৪০টি আসন পেতে পারে।

এক্সিট পোল-এর সম্ভাব্য ফলাফল

গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন—মোট ১৮২ আসন

দল	সি ভোটার	এবিপি নিউজ-লেনসন	নিউজ-২৪ চাণক্য	আজতক ও আর জি
বিজেপি	১২০	১২৬	১৪০	১১৮-১২৮
কংগ্রেস	৫৮	৫০	৪০	৫০-৫৬
জিপিপি	২	২	০	১-২
অন্য	২	৪	২	৪-৬

মাদকদ্রব্যের অবাধ চাষ ছিটমহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোচবিহারের ছিটমহল এলাকায় অবাধে চলছে গাঁজা চাষ। প্রশাসন নির্বিকার। নির্বিকার থাকাই তাদের দস্তুর কারণ ছিটমহল এলাকায় প্রশাসনের অস্তিত্বের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। আর প্রশাসনহীনতার সুযোগ পুরো মাত্রায় কাজে লাগাচ্ছে বাংলাদেশিরা। টাকার লোভে ভারতীয়দেরও এই কাজে যুক্ত হতে বাধ্য করছে তারা। এমনিতে 'ছিটমহল'-এর মানুষ 'রাষ্ট্রহীন' হওয়ায় তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বর্তমান ভারত-বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রেরই এ বিষয়ে বিশেষ হেলদোল নেই। সুতরাং হতদরিদ্র ভারতীয়দের নিষিদ্ধ ব্যবসায় সহজেই প্রলোভিত করতে পারছে অনুপ্রবেশকারীরা।

সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের কাছে অতি গোপন রিপোর্ট এসে পৌঁছোয় যে ছিটমহলের বাসিন্দারা নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের চাষ করছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো (এন সি বি)-র তথ্য বলছে, কোচবিহারের অন্তত হাজার বিঘে এলাকা জুড়ে চলছে এই চাষ। যেটুকু ধান, গম কিংবা ভুট্টার চাষ হোত, তার বদলে সেই জায়গায় এখন গাঁজা চাষ চলছে। প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশি ছিটমহলগুলি 'বিদেশী ভূমি' হিসেবেই চিহ্নিত। সুতরাং ভারতের আইনের শাসন ওখানে প্রযোজ্য নয় এবং এদেশের প্রশাসনের পক্ষে সেখানে গিয়ে গাঁজা চাষের মোকাবিলা করাও সম্ভব নয়, এমনটাই যুক্তি প্রশাসনের। প্রসঙ্গত, ২০১১-র সেপ্টেম্বরে ছিটমহল বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

নারকোটিস ব্যুরো জানাচ্ছে, ছিটমহলবাসীদের সঙ্গে শহরের কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় কো-অর্ডিনেশন কমিটির সচিব দীপ্তিমান সেনগুপ্ত বলেন, ''ছিটমহলবাসীরা বাঁচার চেষ্টা করছেন। আমরা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছি এবং এখনও ধৈর্য রাখছি। গত বছর আমরা বহু মাদকব্যবসায়ীকে ছিটমহলে ঢুকতে এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে কোনওরকম চুক্তি করতেও বাধা দিয়েছি। যদিও এবছর আমরা সেরকম কোনও পদক্ষেপ নিইনি। কারণ আমরা ভাবছি, ৫০,০০০ মানুষ কীভাবে জীবন-রক্ষা করবেন যদি সরকার বিন্দুমাত্র তাদের প্রতি সদয় না হয়। নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর পক্ষ থেকে এও জানানো হয়েছে, পোয়াতুরকুঠী, বাহালিছাড়া, মালগ্রাম, খালনাপুর, জোঙ্গরা, পূর্ব মশালডাঙ্গা, কারোলা, বকরগাছি ইত্যাদি ছিটমহল এলাকায় জোরকদমে অবাধে গাঁজা চাষ চলছে বলে তাদের কাছে নিশ্চিত খবর রয়েছে।

ব্যুরোর জনৈক আধিকারিকের বক্তব্য, ''চাষ হওয়া গাঁজা অত্যন্ত বেশি দরে বিকোচ্ছে। ফলে শস্যচাষের সম্ভাবনাময় এলাকায় মাদকদ্রব্যের চাষ হওয়াটা আদৌ আশ্চর্যের নয়। ২০১১-য় কিছু গাঁজা গাছ ধ্বংসের চেষ্টা আমরা করেছি, কিন্তু কূটনৈতিক কারণেই এটা সার্বিকভাবে করা যাচ্ছে না। এবছর আমরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ছিটমহলের বাসিন্দাদের নিয়েও বৈঠক করেছি যাতে বাজারে আসার আগেই মাদকদ্রব্যগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা যায়।''

নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর তরফে জানানো হয়েছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক, যা কোচবিহারের অসম-বাংলাদেশ সীমান্তের সন্তোষ নদী থেকে উত্তর দিনাজপুরের বাংলা বিহার সীমান্তের ঈশ্বরপুর (ইসলামপুর) পর্যন্ত ভায়া জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, যা এককথায় শিলিগুড়ি করিডোর নামে খ্যাত, সেইসঙ্গে ভুটান, নেপাল, তিব্বত এবং বাংলাদেশের ১০০ কিমির কাছাকাছি সীমান্তে চোরকারবারিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। যেখান দিয়ে মাদকদ্রব্যগুলি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চালান হচ্ছে।

সংসদকে এড়িয়ে গোপনে বিরল পরমাণু খনিজ সম্পদ পাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের মানুষ ও সংসদকে এড়িয়ে গিয়ে কিছু রাজনৈতিক নেতা, আমলা ও ব্যবসায়ীদের একটা দুষ্টচক্র ব্যাপকভাবে অপরাধী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের নিউক্লিয়ার পাওয়ার সেক্টরের নিয়ন্ত্রক কি ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ গোপনে করপোরেট হাঙ্গরদের লুঠ করতে সুযোগ করে দিয়েছে। এবং এটা করা হচ্ছে সভ্য সমাজ ও প্রচলিত নিয়মনীতিকে খোলাখুলিভাবে অবজ্ঞা করেই। বিষয়টির জন্য যে সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন, তাও তারা এড়িয়ে গেছে। এইভাবে সংসদকে অন্ধকারে রেখে যে খনিজ সম্পদ লুঠ করা হচ্ছে তা নিয়ে সোচ্চার হয়েছে দেশের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি। গত ১৩ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু এই চোরাচালান অবিলম্বে বন্ধ করার দাবী জানিয়েছেন।

ভারতের উপকূল বরাবর এইসব বিরল খনিজ সম্পদ রয়েছে। যেমন, লেমেনাইট (Limenite), রিউটাইন, লিউকক্সনি (Laucoxene), জিরকোন (Zircone)। আন্তর্জাতিক বাজারে এইসব খনিজ সম্পদের মূল্য অনেক চড়া। অথচ কয়েকটি করপোরেট ফার্মস দেশের সরকারকে এক টাকাও রয়ালটি না দিয়ে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষকে এইভাবে ঠকানোর এ এক বিরল নজির।

প্রশ্ন উঠেছে,

- এন এস জি লবির চাপেই কি প্রস্তাবিত অ্যাটমিক মিনারেলস ও জি এল (ওপেন জেনারেল লাইসেন্স)-কে হস্তান্তরিত করা হলো?
- ভারত-মার্কিন চুক্তিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য এটা কি একটা শর্ত ছিল?

সব মিলিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ইউপিএ সরকার কি আবার একটা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ল?

মোদী চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন

গূঢ়পুরুষের

কলম

দুই দফায় গুজরাট রাজ্য বিধানসভার ১৮২টি আসনে ভোটপর্ব নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে তখন নির্বাচনী ফলাফলও সকলের জানা হয়ে গেছে। তবে ২০ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ফলাফল ঘোষণার বহু আগেই দেশবাসী মিডিয়ার সৌজন্যে জানতেন যে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী চতুর্থবারের জন্য বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরছেন। তাই ফলাফল নিয়ে সংশয় ছিল না। শুধু আগ্রহ ছিল এবার বিজেপি-র আসন কতটা বাড়বে। বিগত ২০০৭ সালের নির্বাচনে বিজেপি তার ২০০২ সালের নির্বাচনে জেতা ১০টি আসন হারিয়ে ছিল। ২০০২-তে মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি জেতে ১২৭টি আসনে। গোধরা পরবর্তী দাঙ্গার জন্য তখন দেশজুড়ে মোদী বিরোধিতা চরমে উঠেছিল। মিডিয়া দাঙ্গার সব দোষ তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। সেদিন কোনও যুক্তি বুদ্ধি কাজ করেনি সাংবাদিকদের। কংগ্রেস এবং আমেরিকার আর্থিক অনুদানে দিল্লীর জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল এবং ইংরেজি সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা রাতারাতি কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন। মহার্ঘ্য বিদেশী গাড়ি, বিলাসবহুল ফ্ল্যাট সবই দিল্লির 'দরিদ্র' সাংবাদিকরা কিনে ফেলেছিলেন। শর্ত ছিল একটাই। গুজরাট থেকে মোদীকে হঠাতে হবে। কিন্তু হাজার কোটি টাকা খরচ করেও মোদীকে হঠানো যায়নি। ২০০২ সালের নির্বাচনে বিজেপি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ১৮২টি আসনের মধ্যে ১২৭টি আসন দখল করে। কংগ্রেস জেতে মাত্র ৫১টি আসনে। কংগ্রেসের দাঙ্গার রাজনীতি ব্যর্থ হয়। এরপর ২০০৭ সালের নির্বাচনে বিজেপি জেতে ১১৭টি আসনে। অর্থাৎ ১০টি আসন কমে যায়। এই আসনের ৮টি যায় কংগ্রেসের ঝুলিতে এবং ২টি আসনে জেতে বিক্ষুব্ধ বিজেপি প্রার্থী 'নির্দল' টিকিটে লড়ে। তাই আগ্রহ ছিল বিজেপি তার হারানো আসন পুনরুদ্ধার করতে পারবে কিনা।

নরেন্দ্র মোদী চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হলেও জানিয়ে রাখি এটি ছিল গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর তৃতীয় নির্বাচন। কেশুভাই প্যাটেল পদত্যাগ করলে ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রীর পদের দায়িত্ব নেন। দায়িত্ব নেওয়ার এক বছর পরেই ২০০২ সালে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে গুজরাটের মণিনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। এবার তৃতীয়বারের জন্য তিনি মণিনগর কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন। মণিনগরকে তাই নরেন্দ্র দামোদর দাস

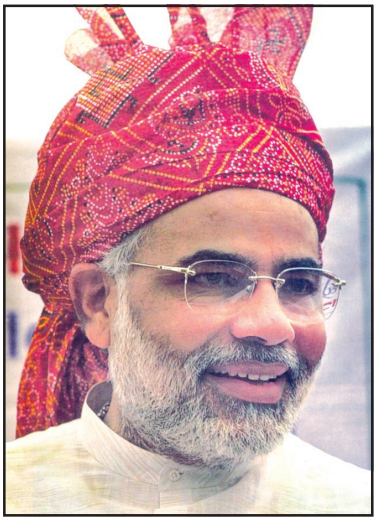

মোদীর চোখের মণি বলা হয়। মণিনগর কখনও তাঁকে শূন্য হাতে ফেরায়নি। গুজরাটের সার্বিক উন্নয়নের মন্ত্রগুরুর জন্ম ১৯৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম এ নরেন্দ্র মোদী বাল্যকাল থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। আজও সেই বন্ধন অটুট। তাঁকে রাজনীতিতে দীক্ষা দেন প্রবীণ বিজেপি সাংসদ লালকৃষ্ণ আদবানি। গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় মোদী এবং তাঁর দল বিজেপি-কে ফাঁসাতে চেয়েছিল কংগ্রেস এবং তার দোসর কম্যুনিস্টরা। বিগত তিনটি নির্বাচনেই কংগ্রেসের প্রচারের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, দাঙ্গার দুঃখজনক স্মৃতি উসকে দিয়ে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক দখল করা। এই ভোট বিভাজন নীতির জন্যই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব বিপুল টাকা খরচ করে কেশুভাই প্যাটেলের গুজরাট পরিবর্তন পার্টি খাড়া করেছিল। দক্ষিণ গুজরাটের সৌরাষ্ট্রে প্যাটেল সম্প্রদায়ের সমর্থনের উপর নির্ভর করে কোন দল জিতবে অথবা হারবে। নরেন্দ্র মোদী প্যাটেল সম্প্রদায়ের নন। তাঁর জন্ম গুজরাটের অনগ্রসর জাতিতে। সৌরাষ্ট্রে প্যাটেলরা মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ। কেশুভাই নিজে একজন প্যাটেল সম্প্রদায়ের প্রবীণ নেতা। সোমনাথ মন্দির ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। কংগ্রেসের অঙ্গ ছিল প্যাটেলরা যদি একজোট হয়ে তাঁদের সম্প্রদায়ের নেতাকে ভোট দেন তবে দক্ষিণ গুজরাটের ৮৭টি আসনের অধিকাংশতেই বিজেপি হারবে। কংগ্রেসের এই সাম্প্রদায়িক বিভাজন নীতি যে খাটতো না তা বোঝা গিয়েছিল যখন কেশুভাইয়ের খাস তালুক সোমনাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে নরেন্দ্র মোদী প্রথম দফার নির্বাচনের প্রচার শুরু করেছিলেন। বিপুল সাড়া পড়েছিল মোদীর ভোট প্রচারে। প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পড়েছিল প্রথম দফায়। যা একটি রেকর্ড। বিগত কোনও নির্বাচনেই দক্ষিণ গুজরাট ৬২ শতাংশের বেশি ভোট পড়েনি। তখনই আন্দাজ করা গিয়েছিল এবারেও নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরছে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে, গুজরাটের ভোটদাতারা মোদীতে আস্থা রেখেছিলেন কারণ দেশজুড়ে আর্থিক মন্দার মধ্যেও রাজ্যে চোখে পড়ার মতো আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। গুজরাটে মোদীর শাসনে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি সারা দেশের মধ্যে এক নম্বরে। কৃষির উন্নতি ঘটাতে নর্মদা নদী থেকে সেচের জল পৌঁছে দিয়েছে মোদীর প্রশাসন। গুজরাটের ঝাঁ চকচকে মসৃণ হাইওয়েগুলি বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ। স্বাস্থ্য ও পুর পরিষেবায় মোদীর বিপুল সাফল্য। এরপরেও ভোটদাতারা কোন দুঃখে কংগ্রেসকে ভোট দেবেন? 'মহারাণী' সোনিয়া গান্ধী তাঁর পুত্র যুবরাজ রাহুলকে দিল্লীর মসনদে বসাতে মরিয়া হয়ে এবার গুজরাটে প্রচার চালিয়ে ছিলেন। রাহুলের কাছেও গুজরাটের নির্বাচনের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর আগে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনেও তিনি ছিলেন দলের প্রধান কাণ্ডারী। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়। একথা অজানা নয় যে কংগ্রেস একটি নির্বাচনসর্বস্ব দল। যে নেতা বা নেত্রী নির্বাচনে দলকে জেতাতে পারেন তাঁকেই দল কুর্নিশ করে। রাহুল গান্ধী দলকে জেতাতে ব্যর্থ। এরপর কীভাবে গান্ধী পরিবার প্রভাব খাটিয়ে রাহুলকে প্রধানমন্ত্রী করতে পারে সেটাই দেখার।

তৃণমূল কোন পথে?

নিশাকর সোম

গত মঙ্গলবার (১১ ডিসেম্বর) বিধানসভায় শাসকদল এবং বিরোধী দলের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছিল। এর ফলে বিরোধী বিধায়ক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় এবং দেবলীনা হেমব্রম আহত হয়ে এস এম এস হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান। সেখানে তাঁদের কার্যত চিকিৎসা না করে ফেরত দেওয়া হয়। পরে বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসায় জানা গেল যে— গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জির করোটিতে চিড় দেখা গেছে এবং দেবলীনার পেটে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে, কারণ পেটে পাথর আছে। বিধায়কদের চিকিৎসাতেও কি আমরা-ওরা দেখা যাচ্ছে? স্মরণ করা দরকার বামফ্রন্ট বিধানসভায় তদানীন্তন বিরোধীদলের অর্থাৎ তৃণমূলের এক বিধায়কের বুকের যন্ত্রণায় চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসেন ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি বলেছেন, 'আমি এই ব্যাপারে চিকিৎসায় পারদর্শী।' যাক সেকথা। এখন প্রশ্ন হলো— রাজ্য বিধানসভায় কেন এমন ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে গেল? দেখা যাচ্ছে, চিটফান্ড নিয়ে প্রশ্ন করাতেই এই হাঙ্গামার সূচনা হয়েছিল।

চিটফান্ডের সমর্থনে চিট-ফান্ড পরিচালিত একটি দৈনিক-এ লেখা হয়েছে— 'চিটফান্ড-এর কাছ থেকে সিপিএম টাকা তুলেছে। এখন পাচ্ছে না বলে এই নিয়ে হইচই করছে।' উল্লেখ করা প্রয়োজন বহু পূর্বে মালদার সাংসদ, এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবু হাসেম খান চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গে চিটফান্ড সংস্থাগুলির সঙ্গে তৃণমূলের গভীর-সম্পর্কের অভিযোগ করে প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি দেন এবং মমতার চাপে প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারটি নিয়ে আর এগোননি বলে খবর। এরপরই তৃণমূল সাংসদ সোমেন মিত্র প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-কে চিঠি দিয়ে লেখেন— ''আকাশছোঁয়া লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রামের গরিব মানুষের কাছ থেকে এই রাজ্যে চিটফান্ডগুলি টাকা তুলছে।''প্রধানমন্ত্রীকে সোমেনবাবু কেন চিঠি দিলেন— এই প্রশ্ন নেত্রী জিজ্ঞাসা করলে, সোমেন মিত্র জবাব দেন— 'এটা গুরুতর অর্থনৈতিক বিষয়, এটা আপনার বিষয় নয়।'' মমতার প্রতিবাদ— 'আমাকে জানাবেন, যা করবার আমি করবো।' সোমেন মিত্র তাঁর অবস্থানে অনড় থাকেন। এরই জন্য কি সোমেন-জায়া শিখা মিত্র সাসপেন্ড হলেন? এতো 'ঝি-কে মেরে বউকে শিক্ষা দেওয়া।'

রাজ্যের চিটফান্ডগুলির রমরমা ও বেআইনি ব্যবসা নিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সাধন পাণ্ডে 'কেন্দ্রীয় কর্পোরেটমন্ত্রী বীরাপ্পা মইলিকে চিঠি দেন। প্রশ্ন ওঠে— 'মমতা যদি গরীব-দরদী হন তবে ফন্দিবাজ চিট-ফান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন?'' চিট-ফান্ডের বিতর্কের ইতিপূর্বের ইতিহাস সংবাদপত্রের বিবরণ হলো— '২৬ আগস্ট কেন্দ্রীয় কর্পোরেট বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ্যে ৮৮৭টি চিট ফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় সরকার মাল্টিলেভেল মার্কেটিং (এম এল এস)-এর

বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। ইউপিএ-২ সরকারের প্রধান শরিক দল হওয়ার সুবাদে নেত্রী-মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রভাব খাটিয়ে তদন্তের কাজ আটকে দেন। প্রতিমন্ত্রী আর এম এস সিং ঘোষণা করেন যে, সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন দফতরকে (এস এফ আই-ও) তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা যেন চিটফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই ব্যবস্থা প্রাইজ চিটফান্ড অ্যান্ড ম্যানি সার্কুলেশন স্কিম (ব্যানিং) আইন, ১৯৭৮ (পি সি এম সি এম) আইন করে তদন্তে নামে। কেন্দ্রীয়-সরকার তারপর জানতে পারে চিটফান্ড সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ প্রশাসন কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বহু অভিযোগ যায়। এর পূর্বে সেবি, রোজভ্যালি, গ্রিন ফিল্ডস-এর মতো ১২টি সংস্থাকে যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য কে ডি সিং-এর মালিকাধীন অ্যালকেমিস্ট-এর ব-কলমে বহু চিটফান্ড সংস্থার নিয়ন্ত্রণ করছে। যারা পরে সারদা গোষ্ঠীর সঙ্গে নাকি আঁতাত করেছিল? এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তৃণমূলের জনৈক রাজ্য-সভার সাংসদের নিকট লক্ষ লক্ষ টাকার সন্ধান পাওয়া যায়। যিনি নাকি অসমে নির্বাচনী প্রচারে যাচ্ছিলেন? এইভাবে চিটফান্ড সংস্থার সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক নিয়ে বহু অভিযোগ ওঠে। এই অবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি এ বিষয়ে সোনিয়া গান্ধীর রাজনৈতিক সচিব আহমেদ প্যাটেলকে মধ্যস্থ করার জন্য অনুরোধ জানান। এমতাবস্থায় চিটফান্ড-এর বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যম সোচ্চার হলেও কম করে ৫টি-৬টি দৈনিক-এ চিটফান্ড-এর পক্ষে লিখেছেন— 'চিটফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে কয়েক লক্ষ পরিবার বিপর্যয়ে পড়বে।' কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য এখনই রাজ্য-সরকারের সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। কারণটা হলো গুজরাট ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখে রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেবেন সোনিয়া গান্ধী। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করছেন। কেন? মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাতে উপস্থিত হতে চাইছেন না কেন? তিনি মানবাধিকার কমিশনের অনুষ্ঠানেও যাচ্ছেন না। এদিকে বিধানসভার ঘটনায় রাজ্য-কংগ্রেস সিপিএম ও তৃণমূল দু'জনকেই দোষী বলেছে। তৃণমূলের একদা-সঙ্গী এমন বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিধানসভার ঘটনায় সরকার পক্ষের নিন্দা করেছে। একদা মমতার পরিবর্তনের আন্দোলনের অন্যতম নেতা অভিনেতা-নাট্যকার কৌশিক সেন বলেছেন— 'রাজ্যে কোনও পরিবর্তন হয়নি। জনগণ তাই পরিবর্তন চাইছেন।' তৃণমূলনেতা শোভনদেববাবু আর অগ্রসর হবেন না— তিনি নেত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন বলে সংবাদ রটেছে— তিনি চিফ হুইফ পদ বজায় রাখতে চান। সোমেন-জায়া বিধায়ক শিখা মিত্র বলেছেন— 'আমি সোমেন মিত্রকে তৃণমূলে এনেছি। আমার স্বামী বহু এম-এল-এ এবং সাংসদ তৈরি করেছেন।' তৃণমূলে কি ভাঙন দেখা দেবে না পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর দ্বন্দ্ব দেখা দেবে? সাসপেন্ড বহিষ্কার-এর দণ্ড তৃণমূলী নেতা- কর্মীদের উপরও কি নেমে আসবে?

ঘাসফুলে বেশ শীত পড়েছে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দিদি,

শীতের শুভেচ্ছা। কিন্তু শীতও এবার যেন শীত ঘুম দিয়েছে। গোড়া থেকেই এই এলুম এই গেলুম ভাব। ক্যালেন্ডার অবশ্য বলে দিয়েছে এসে গেছে। ছোট্ট ফ্রক পরা মেয়ের মতো গুটি গুটি পায়ে হাঁটছে, খেলছে আর দেখছে। কী দেখছে? দেখছে, তাকে ঘিরে কত উৎসব।

এই তো দিল্লীতে কী একটা অধিবেশন হলো। সবাই ক'দিন ধরে চিৎকার চেঁচামেচি করল, ভোটাভুটি করল। নাম দিয়েছিল শীতকালীন অধিবেশন। এই কলকাতাতেও তো একই নামে একটা মারামারি কম্পিটিশন হয়ে গেল। এরপর আবার উদ্বোধন, উদ্বোধন খেলা চলছে। সার্কাস এসেছে। মেলা বসেছে। ছোট্ট শীত অবশ্য দিল্লি কিংবা কলকাতার অধিবেশন নামের কাণ্ডটাকেও সার্কাস কিংবা মেলা ভেবেছে। ওর আর দোষ কী বলুন। সেখানেও তো কেউ ডিগবাজি খাচ্ছে, কেউ গলাবাজি করছে। কেউ কেউ আবার পোস্টার টোস্টার নিয়ে চড়ুইভাতিও করছে।

যাকগে দিদি, ওসব কচি মেয়ের কথা নিয়ে আমাদের মতো ধেড়েদের মাথা না ঘামানোই ভাল। সংসদ, বিধানসভার মতো গুরুগম্ভীর জিনিস নিয়ে ও যেসব ভাবছে তা যদি ছোট মুখে বলেও ফেলে তবে সেটা আনপার্লামেন্টারি হবেই। তাই চুপ থাকাই ভাল।

বরং শীতটা ঠিক মতো না পড়ায় আপনার জন্য কষ্ট হচ্ছে দিদি। পাহাড় শান্ত। শীতে আরও শান্ত। দেড় বছরে জঙ্গলে আপনার চারবার পিকনিক হয়ে গেছে। বারবার এক দারিদ্র্য দেখতে ভাল লাগে না। দীঘায় এখন বড্ড হইচই। মেলা মানুষের ভিড়। গোপালপুর, মন্দারমণির দশাও তাই। সেখানে তো আবার মা-মাটি-মানুষ স্লোগান অচল। ওখানে মা-বালি-মানুষ। সে যাকগে, পাত্রমিত্রদের নিয়ে যে এই না পড়া শীতে কোথায় বেড়াতে যাবেন! সুন্দরবনটা কিন্তু মন্দ নয়। বেশ লঞ্চে করে গরম কফি আর দুষ্প্রাপ্য কাঁকড়া ভাজা দিয়ে অতিথি সৎকার করা যায়। কিন্তু দলের মধ্যে যা শুরু হয়েছে তাতে কটাদিন যে ঘুরেফিরে একটু মন হালকা করে আসবেন তার উপায় নেই। অবসর কোথায়!

প্রথমেই বড় চাপ ছিল মন্ত্রিসভায় রদবদল। সেটা না হয় হলো। কৃষ্ণেন্দু আর হুমায়ুন দু'দুটো ইমপোর্টেড মন্ত্রী নিয়ে চালটা ভালই হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক ব্যালেন্সটাও খারাপ হয়নি। কিন্তু সিঙ্গুরের মাটি থেকে উঠে এল বিক্ষোভের স্লোগান। রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের ডানা ছেঁটেছেন, রচপাল সিংয়ের ছেঁটেছেন, শ্যামল মণ্ডলকে গোটাটাই ছেঁটে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু হয়নি। ওঁদের তো আসলে কিছুই পাওয়ার ছিল না। তাই যেটুকু পেয়েছেন সেটাই সারা জীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের ক্ষেত্রে সেটা তো নয়। তাই উনি ছোবল মেরেছেন। তাতে বিষ আছে কি নেই সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু ক্ষত বেশ দগদগে।

ভয় করে দিদি। এই সিঙ্গুর থেকেই যে, বুদ্ধবাবুর শেষের শুরুটা হয়েছিল।

না না। আপনার ক্ষেত্রে এমন কোনও ইঙ্গিত কোনও ...দিতে পারবে না। কিন্তু দেখুন সিঙ্গুরের রবির বাণী যে আলুর ধসা রোগের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। কদিন যেতে না যেতেই বেচারাম ব্যাঁকা মন্তব্য করে ডুবল। আপনাকেও ডোবাল। ভাসিয়ে তুলল আপনার আদালত বিরোধী পুরনো মন্তব্যকে। এদিকে আবার শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তোপ দেগে চলেছেন একের পর এক। চারিদিকে এমন একটা ভাব যেন আপনার থেকে শোভনদেবকে কেউ বেশি ভালোবাসে। কেন ওঁকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়নি? কেন ওঁকে দলের মধ্যে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে? কাগজে টিভিতে হাজারটা প্রশ্ন। আরে বাবা, আপনার দলে, আপনার সরকারে আপনি কাকে রাখবেন, কাকে ফেলবেন, কাকে তুলবেন, কাকে নামাবেন সেটা তো আপনারই স্বাধীনতা নাকি! আপনিই তো দলের কোচ থেকে কর্ণধার সব কিছু। শিখা মিত্তিরও কম যান না। কে চিনত আপনি না থাকলে? ওঁর স্বামীকে কে সাংসদ বানাত? ওঁকেই বা কে বিধায়ক করে আনত? নেমকহারাম। চলতি কথায় বলতে গেলে এর থেকে শ্লীল গালাগাল আর কিছু মনে পড়ছে না দিদি। তাড়িয়ে দিয়ে ভাল করেছেন।

সামনে পঞ্চায়েত ভোট। কিন্তু কোথাও আপনি ছাড়া দলের কারও ওপর মানুষের ভরসা নেই। আপনার কোনও নেতার ওপর নেই। আপনি যদি সবকটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিজে গিয়ে প্রচার করতে পারেন তবেই দলকে বাঁচানো সম্ভব। নচেৎ নয়। ধুয়ে মুছে হয়তো যাবে না, কিন্তু...

আমি জানি, আপনিও সেটা ভালোই জানেন। তাইতো লোবা গ্রামে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে নিজেই চলে গেছেন। এরকম অনেক জায়গায় আপনাকে যেতে হবে জানি। না গিয়ে উপায় নেই।

আপনি কি জানেন ঘরে বসে বসে কবীর সুমন এখন গান লিখে, গান গেয়ে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। সম্প্রতি আপনাকে নিয়েও একটা গান লিখেছেন। আপনাকেই উৎসর্গ করেছেন। জানি আপনি দোষ নেবেন না। তাই চিঠির শেষে গানটার কিছুটা তুলে দিলাম।

মমতার জন্য

আমিও ছিলাম ভুলো না মমতা, আমিও
ছিলাম সঙ্গে
আমিও এনেছি পরিবর্তন এই পশ্চিমবঙ্গে
চিত্ত যেখানে ভয় হীন আর উচ্চ
যেখানে শির
তোমারই রবীন্দ্রনাথ এখন ভয়েতে
অস্থির...
নির্ভয়ে ভালো থাকবেন দিদি।

— **সুন্দর মৌলিক**

তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬ অনুচ্ছেদ : কেন বিতর্কিত ?

তারক সাহা

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মামলা সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। আমাদের এই রাজ্যে বেশ কয়েকমাস আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। তাঁর অপরাধ : ইন্টারনেটের এক কার্টুন যার মুখ্য ভূমিকায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সঙ্গীরা। অম্বিকেশবাবু তাঁর ব্যক্তিগত কমপিউটার থেকে ওই ই-মেলটি ফরওয়ার্ড করেন তাঁর জনৈক বন্ধুকে। আর তাতেই বেজায় চটে যায় রাজ্যপ্রশাসন। পুলিশ ধরে নিয়ে যায় অম্বিকেশবাবুকে। তাঁর একরাত হাজতবাসের পরিণামে মমতা সরকারের বিরুদ্ধে শুরু হয় দেশজুড়ে ধিক্কার। জল গড়ায় রাজ্যের মানবাধিকার কমিশন থেকে সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত। অবশ্য এতে অম্বিকেশবাবু একা নন। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে শিবসেনা সুপ্রিমো বালাসাহেব ঠাকরের জীবনাবসানের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে দুই মহিলার মধ্যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে যে কথা চালাচালি হয় তা নাকি আপত্তিকর এবং এই কারণে আই টি ৬৬-এ ধারায় গ্রেপ্তার হন ওই দুই মহিলা।

ইদানিংকালে আমাদের দেশের তামাম রাজনৈতিক নেতারা বড্ড বেশি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছেন নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির সমালোচনা শুনতে। ১৯৮৮ সালে বোফর্স মামলা নিয়ে সারা দেশ যখন তোলপাড়, তৎকালীন রাজীব সরকার তাঁর সরকার বিরোধী অভিযোগগুলির কণ্ঠরোধ করতে সংসদে 'অবমাননা বিরোধী' বিল পেশ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো ৪০০-রও বেশি সাংসদ সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও প্রবল জনরোষে সরকার তা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বর্তমান ইউপিএ সরকার ('Government of at most perfidious activities') তার বিরুদ্ধে ওঠা বিবিধ দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা চলছে তা দমনের সাধ থাকলেও সাধ্য নেই সংসদে জরুরি প্রয়োজনীয় সংখ্যার জন্য। তাই পরোক্ষে আই টি অ্যাক্টে ৬৬-এ ধারা প্রয়োগের চেষ্টা চালাচ্ছেন কপিল সিব্বাল। মন্ত্রী না মানলেও এই আইনের অপপ্রয়োগ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে, অথচ ওই ধারার

ভারতীয় দণ্ডবিধি	৬৬-এ ধারা (আই টি অ্যাক্টের অধীনে)
১. ধারা ৫০০ থেকে ৫০২ ধারায় বর্ণিত রয়েছে ছাপার অক্ষরে, কারুর বিরুদ্ধে অবমাননাকর বা আপত্তিজনক বিষয় ছাপা হলে বা তা বিক্রি হলে—বিক্রেতা, প্রকাশক, লেখকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। শাস্তি—অভিযোগ প্রমাণিত হলে ২ বছর কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা দুই-ই। ২. একই ধরনের সংস্থান রয়েছে ধারা ৫০৪-এ। শাস্তি—২ বছরের জেল, জরিমানা বা দুটো-ই। ৩. ধারা ৫০৪-এ অনুরূপ সংস্থান রয়েছে। শাস্তি—দু বছরের কারাবাস, জরিমানা। ৪. একই অন্যায়ের তিন বছরের জেলের বা জরিমানা বা দুটোরই বিধান রয়েছে ৫০৪ এবং ৫০৫ ধারায়।	১. যে কোনও তথ্য যা আপত্তিজনক এবং সমস্যা সৃষ্টি কারক। শাস্তি—তিন বছর কারাবাস এবং জরিমানা। মন্তব্য—এই ধারায় শাস্তির পরিমাণ অধিক। ২. যে কোনও তথ্য যা প্রেরক জানে মিথ্যা কিন্তু কমপিউটারের মাধ্যমে প্রেরক যদি কাউকে উত্যক্ত করতে, অসুবিধায় ফেলতে সাহায্য করে। শাস্তি—তিন বছরের কারাবাস এবং জরিমানা। মন্তব্য—শাস্তির বহর এখানেও বেশি। ৩. কোনও তথ্য প্রেরক মিথ্যা জেনেও কাউকে পাঠায় তাকে ভয় প্রদর্শনের জন্য, অপমান, বাধা প্রদান বা কোনওরূপ আঘাত প্রদান করা বা তার প্রয়াস করা। শাস্তি—এখানেও সেই তিন বছর জেল ও জরিমানা। মন্তব্য—এখানেও সেই একই ব্যাপার। শাস্তির বহর অধিক। ৪. যে কোনও প্রেরিত তথ্য শত্রুতা বা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট করে। শাস্তি—৩ বছর জেল, জরিমানা।

আনীত অভিযোগের মামলা চলা এবং শাস্তিবিধানের সংস্থান বিস্তারিতভাবে রয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধির সংহিতায় (Indian Penal Code)। ওপরের উল্লেখিত দুটি সাম্প্রতিক ঘটনা সিব্বাল সাহেবের যুক্তি খণ্ডন করেছে। ওই দুই ঘটনাতেই রাজ্যের শাসককুলকে খুশি করতেই ম্যাজিস্ট্রেটের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়াই স্থানীয় থানা গ্রেপ্তার করেছে তথাকথিত অভিযুক্তদের। কপিলের মতে প্রচলিত ভারতীয় দণ্ডবিধিতে যে সংস্থান রয়েছে তা অপ্রতুল আর সেইজন্যই দরকার এই নয়া আইনের প্রয়োগ। দুটি আইন আক্ষরিক অর্থে এক হলেও ভারতীয় দণ্ডবিধিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য চাই ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা আনীত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর তথ্যপ্রযুক্তির আইনে এই পরোয়ানার প্রয়োজন নেই। এ যেন অনেকটা সেই জরুরী অবস্থায় সময়কালীন ইন্দিরা সৃষ্ট 'মিসার' মতো।

এই বিষয়ে বিভিন্ন আইনজ্ঞদের অভিমত অনেকটাই কাছাকাছি যা সিব্বালের অভিমতের বিরুদ্ধ। যেমন প্রাক্তন ভারতীয় প্রধান বিচারপতি জে. এস ভার্মার মতে "এই আইন হলো শক্তিমান শাসককুলকে বিরক্ত বা বিরাগভাজন করায় শাস্তির বিধান। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে যেসব সংস্থান আছে সেটাই যথেষ্ট।" সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে ভার্মা খুশী। সংবিধান বিশেষজ্ঞ হরিশ সালভে এবং সিনিয়র আইনজীবী সুশীল কুমারের বক্তব্যও একই সুতোয় বাঁধা।

সুশীল কুমারের মতে, মুম্বাইয়ে ফেসবুকে যে দুই মহিলা বাল ঠাকরের মৃত্যু নিয়ে মতামত আদান-প্রদান করেছিল তা আদৌ কারুর অবমাননা পর্যায়ে পড়ে না। তবুও তাদের গ্রেপ্তার হতে হলো এবং প্রশাসনও বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছে। কারণ এই বিষয়টা যেহেতু গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি তাহলে তা কীভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে দুই অভিযুক্তদের? প্রশ্ন কুমারের।

বিষয়টা অনেকটা দুজনের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদানের মতো। আবার জি. ই. বাহনাবতি যিনি সরকার পোষিত আইনজীবী তিনি ৬৬-এ ধারাটির সমর্থক হলেও যেভাবে দুই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা একেবারেই অনুচিত বলে জানিয়েছেন। সমস্যা হলো এই যে, আইন যখন রয়েছে তার তো অপপ্রয়োগ হতেই পারে। থানার বড়কর্তা বা শাসকবর্গের কোনও কর্তার অপছন্দের কাউকে এই ধারায় ফেলে শাস্তি না হোক, হয়রানি তো করতে পারে। যেমন হয়েছে এই রাজ্যের অম্বিকা মহাপাত্রের বেলায়। দুই আইনের ফারাক কতটা তার একটা তুলনা করা যেতে পারে।

৬৬-এ ধারা সৃষ্টির উৎস

এক শ্রেণীর আইনজীবীদের মতে, আমাদের দেশে এই আইন প্রণয়ন হয় ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে এবং সম্পূর্ণ একই ধরনের আইন বৃটিশ সরকার চালু করেছে ১৯৮৮ ও ২০০৩ সালে আর আমেরিকা চালু করেছে ১৯৯৬-তে। আমাদের দেশে এই আইন একেবারে তুলনায় নবীন হলেও পুরোপুরি এই দুই দেশের প্রণীত আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে। বলা যেতে পারে একেবারে নকল করে প্রণীত হয়েছে আমাদের দেশে। ধারা ৬৬-এ-তে ব্যবহৃত শব্দ বৃটেনে '(Malicious Commissions Act (MCA)' ১৯৮৮ থেকে সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'Any person who Sends' যে another person ইত্যাদি। এই এম সি এ ১৯৮৮-র মাধ্যমে বৃটেনে সরকার বিরোধী অথবা কোনও ব্যক্তি বিরোধী বার্তা চালাচালির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে চাওয়া হয়েছে।

সরকারি আধিকারিকরা এও স্বীকার করেছেন যে, ৬৬-এ ধারায় ব্যবহৃত শব্দ মার্কিন দূরসঞ্চার আইন ১৯৯৬-এর বহু শব্দ অনুকরণ করেছে। মার্কিন মুলুকের এই আইনে কুরুচিপূর্ণ ছবি, ভাষা কমপিউটারের মাধ্যমে কাউকে প্রেরণ করার ওপর বাধা আরোপ করতে চাওয়া হয়েছে। এটা করা হয়েছে যাতে ওইসব কু-রুচিপূর্ণ ছবি বা ভাষা বাচ্চাদের প্রভাবিত করতে না পারে।

আইনজীবীদের বিভিন্ন মহল আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, যেসব অপরাধের কথা ৬৬-এ ধারায় বলা হয়েছে তা ভারতীয় দণ্ডবিধি সংস্থান অনুসারে কেবল দেওয়ানী অপরাধ (Civil Offence) এবং যার শাস্তি কেবলমাত্র ২০০ টাকা জরিমানা আবার একই অপরাধের জন্য ৬৬-এ ধারা মতে শাস্তি হলো তিন বছর পর্যন্ত কারাবাস।

এই ধারা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তবে কি এই ধারাটি সংবিধান বর্ণিত অনুচ্ছেদ ১৯-এ যে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা খর্ব করবে? তার ব্যাখ্যা কি পাওয়া যাবে দেশের উচ্চতম আদালতে পরবর্তী শুনানীতে যেখানে আদালতে পরিষ্কার হয়ে যাবে সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

ক্যাগ নিয়ে মন্ত্রীর বিষোদ্গার গণতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

বিনোদ রাই

বর্তমান অডিটার ও কম্প্‌ট্রোলার জেনারেল বা 'ক্যাগ' বিনোদ রাইয়ের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার সন্তুষ্ট নয় বলেই মনে হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের প্রতিমন্ত্রী ভি. নারায়ণস্বামী ক্যাগ-এর বিরুদ্ধে বেশ তির্যক মন্তব্য করেছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্রী রাই বর্তমান সরকারের আর্থিক অপব্যয় সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার ফলে নারায়ণস্বামী বিরক্ত হয়ে বলেছেন, বর্তমান ক্যাগ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কিছু অন্যায় কথা বলেছেন যা একেবারে অনৈতিক। তিনি ক্যাগের ধৈর্যের অভাবও লক্ষ্য করেছেন এবং সেই সঙ্গে অভিযোগ করেছেন যে, মাঝে মাঝে ক্যাগ তাঁর এক্তিয়ার লঙ্ঘন করেছেন। ক্যাগের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তিনি চেয়েছেন ক্যাগ-কে বহু সদস্য- বিশিষ্ট করা হোক।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং অবশ্য মনে করেন যে, ক্যাগের নিয়োগ নিয়ে নতুন কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার নেই। তাছাড়া নারায়ণস্বামীও যথারীতি তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যার জন্য সংবাদ মাধ্যমের ওপর দোষ চাপিয়েছেন। তবে এইসব বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা নিশ্চয় হয়েছে— তা না হলে হঠাৎ নারায়ণস্বামী ক্যাগ সম্বন্ধে উষ্মা প্রকাশ করলেন কেন? সম্ভবত তাঁরা ক্যাগের ক্ষমতা খর্ব করতে চান, কারণ সমালোচনা সহ্য করার মানসিকতাই তাঁদের নেই।

এই প্রসঙ্গে ক্যাগের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথাটা এসে পড়ে। সংবিধান-বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসুর মতে, ক্যাগের পদটা একটা 'pivotal office'—(ইন্ট্রোডাক্‌শান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ১৭৪)। তার কারণ হলো— কেন্দ্র ও রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর ক্যাগ নজর রাখেন— সরকারের ব্যয় অন্যায্য বা অযৌক্তিক হলে ক্যাগ সেটা পার্লামেন্টকে জানান এবং তার ফলে বিরোধীরা সরকারকে কোণঠাসা করার পর্যাপ্ত সুযোগ পান।

আসলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সরকারের দায়িত্বশীলতার অন্যতম লক্ষণ হলো ক্যাগের অস্তিত্ব। সরকার-পক্ষ জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করেন নানা খাতে— কিন্তু তাতে দুর্নীতির অপদার্থতা, অপচয় ইত্যাদি আছে কিনা, সেটা ক্যাগ দেখেন। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতেই সরকারের আর্থিক অনিয়ম সম্বন্ধে জনপ্রতিনিধিরা ও জনগণ সবকিছু জানতে পারেন। সেইজন্য ডঃ জে সি জোহারী ক্যাগকে 'financial watchdog' বলে চিহ্নিত করেছেন—(ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৭৮৭)। সেদিক থেকে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে, একটা সরকারকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য এই ধরনের পদাধিকারীর প্রয়োজনীয়তা সত্যিই অসীম। সেইজন্য ডঃ সুভাষচন্দ্র মণ্ডল মনে করেন, আমাদের প্রতিনিধিমূলক ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থায় ক্যাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী— (আওয়ার কনস্টিটিউশন, পৃ. ২২৯)।

ডঃ জোহারী ক্যাগের কর্তব্যকে এভাবে তালিকাভুক্ত করেছেন—

- তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারের হিসেব রাখেন;
- তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য-কর্তৃপক্ষের খরচের হিসেব পরীক্ষাও করেন এবং সেই বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট দেন;
- তিনি পার্লামেন্টের পাব্‌লিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির কাজে সহযোগিতা করেন, কারণ ওই কমিটিই হিসেব সম্বন্ধে ক্যাগের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে;
- তিনি ওই কমিটির চূড়ান্ত বৈঠকে যোগও দেন;
- তিনি সরকারি কর্পোরেশান ও প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসেব-নিকেশও দেখেন;
- পার্লামেন্ট উক্ত কমিটির মাধ্যমকে কোনও বিষয়ে তাঁর মতামত চাইতে পারে— সেইক্ষেত্রে তিনি তাঁর মত জানান; এবং
- তিনি রাজ্যের অডিটারদের কাজের তদারকিও করেন।

ডঃ মধুমঙ্গল সিং এই জন্যই মন্তব্য করেছেন, 'Thus it should seen that the Comptroller and Auditor

General has a vital constitutional and administrative role'--- (দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৮০)। বলা বাহুল্য, সরকারের ব্যয়কে সীমার মধ্যে রাখা এবং অপচয় রোধ করার জন্য ক্যাগ নানাভাবে চেষ্টা করে। বিশেষ করে, পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি ও ক্যাগের ওপর এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে— (ডঃ অনুপচাঁদ কাপুর— দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ১৭৪, ২৪৬ ও ২৬৬)।

এটাও লক্ষণীয় যে, হিসেব রক্ষা এবং হিসেব পরীক্ষা— এই দুটো দায়িত্বই ক্যাগের ওপর দেওয়া হয়েছে। জি এস পান্ডে সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন, বহু দেশেই এই দুটো কাজ দুই পৃথক সংস্থা বা ব্যক্তির হাতে থাকে— কিন্তু ভারত এই ব্যাপারে একটা ব্যতিক্রমী উদাহরণ দেখিয়েছে--- (কন্‌স্টিটিউশনাল ল অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৬৫)। ক্যাগ দুই রকম কাজই করে।

যাতে ক্যাগ এই গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে সংবিধান সেইজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও রেখেছে। বলা দরকার— তাঁর স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা রক্ষা করাটা ছিল সংবিধান-রচয়িতাদের অন্যতম লক্ষ্য। সংবিধানে তাই কয়েকটা সুস্পষ্ট অনুচ্ছেদ আছে। প্রথমত, ক্যাগকে ইচ্ছে করলেই ক্ষুব্ধ সরকার পদচ্যুত করতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের যে পদ্ধতিতে বরখাস্ত করা যায়, সেই একই পদ্ধতি এক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হয়। অর্থাৎ পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থক পেলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, তিনি যাতে সরকারকে সন্তুষ্ট রেখে সুযোগ-সুবিধে না নিতে পারেন, সেইজন্য বলা হয়েছে— অবসর গ্রহণের পর তাঁকে অন্য কোনও সরকারি পদ দেওয়া যাবে না। তৃতীয়ত, তাঁকে সরকার আর্থিক দিক থেকেও হেনস্থা করতে পারে না, কারণ তাঁর বেতন পার্লামেন্টই নির্দিষ্ট করে দেয়। চতুর্থত, তাঁর দপ্তরের ব্যয় আসে সঞ্চিত তহবিল থেকে, সেটাও ক্যাবিনেট বা পার্লামেন্ট আটকে দিতে পারে না।

সব শেষে বলা যায়— তাঁর অবসরের বয়সও নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে— কর্তাব্যক্তিরা সেটা বাড়াতে-কমাতে পারেন না।

এইসব ব্যবস্থা থেকে বোঝা যায় যে, সংবিধান-রচয়িতারা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এই পদটা সৃষ্টি করেছিলেন— তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ক্যাগের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক নীতি ও ব্যবস্থাকে প্রখরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

আমরা অবশ্যই বৃটেনের মতো সংসদীয় বা দায়িত্বশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকার যথাক্রমে লোকসভা ও সংশ্লিষ্ট বিধানসভার কাছে দায়ী থাকে। সেখানে সরকারের গরিষ্ঠতা না থাকলে তাকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু ওপরেও রয়েছে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ। এস্টিমেট কমিটি, পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি ও ক্যাগ সেই নিয়ন্ত্রণের কাজ করেন।

অবশ্যই ক্যাগের কাজটা জটিল ও অনেক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর। সরকার বা বিরোধীদল— কোনও পক্ষকেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টার বদলে তাঁকে নিরপেক্ষভাবে কর্তব্য পালন করতে হয়। কিন্তু তাতে অসহিষ্ণু বা অসন্তুষ্ট হয়ে সরকার যদি তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে, তবে সেটা গণতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস বলে ধরে নিতে হবে। পূর্বোক্ত মন্ত্রী মহাশয় ক্যাগের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন— কিন্তু সেই এক্তিয়ার ঠিক করে দিয়েছে সংবিধান, মন্ত্রীর কাজ সেটা নয়। আর ক্যাগের গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য ক্যাগকে বহু সদস্যবিশিষ্ট করার যে কথাটা তিনি তুলেছেন, তাতেই বরং অসহিষ্ণুতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

তার বদলে সরকারের উচিত আর্থিক দিক থেকে পরিচ্ছন্ন থাকা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা। এখনকার কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক দুর্নীতি ও অন্যায়ের পঙ্ককুণ্ডে আকণ্ঠ ডুবে আছে বলেই ক্যাগকে নিয়ে তার বিরূপতা দেখা দিয়েছে। ক্যাগ বিরূপ মন্তব্য করলে একটা সুস্থ ও গণতান্ত্রিক সরকার নিজেকে সংশোধন ও সংযত করে থাকে। এটাই অভিপ্রেত ব্যাপার। কিন্তু যখন দেখি তার বদলে সরকার ক্যাগের সমালোচনা করে এবং তাঁর ক্ষমতা খর্ব করার কথা চিন্তা করে, তখনই ভয় করে— গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকবে তো? গণতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হলো ক্যাগের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা। সেই অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা এবার বিপন্ন হবে কিনা কে জানে।

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ শিবির

পুণ্যস্নান— ১৩ জানুয়ারি,
২৭ জানুয়ারি, ১০ ফেব্রুয়ারি,
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৫ দিন থাকা-খাওয়া ১০০০ টাকা ও ২০০০ টাকা। ট্রেনের টিকিট নিজেরা কাটবেন। স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা আছে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—

রামকৃষ্ণ আশ্রম,
৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কালকাতা-১৩

ফোন : ২২৬৫-৬৭০৪, ৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

ক্যাগের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ দেউলিয়া

দেবব্রত চৌধুরী

ভারতবর্ষে উন্নয়নকল্পে সরকারি রাজকোষ থেকে প্রতি বৎসর বাজেট ঘোষণার মারফত প্রতিটি বিভাগে আর্থিক বরাদ্দ করা হয়। এই বরাদ্দ কৃত আয় সঠিকভাবে সঠিক কারণে খরচ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাশালী বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। সংস্থাটির নাম 'কম্পট্রোলার এন্ড অডিটার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া' এক কথায় যা ক্যাগ নামেই পরিচিত। এই সংস্থাটি সমস্ত প্রদেশের সরকারি বিভাগের খরচ পরীক্ষা করে এবং যদি কোনও বিভাগে খরচে অনিয়ম দেখে তবে উচ্চতর বিভাগে রিপোর্ট করে এবং এই রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের অর্থদপ্তর ব্যবস্থা নেয় অনিয়মের কারণ জানার পর। আমাদের পশ্চিমবঙ্গও এই নিয়মের বাহিরে নয়, আজ আমার আলোচনা পশ্চিমবঙ্গ নিয়েই। মা-মাটি-মানুষ সরকার আসার আগে যে রিপোর্ট ক্যাগ জমা দিয়েছে— প্রদেশের খরচের বহর নিয়ে বিভিন্ন বিভাগে তার কিছু তথ্য আমি পেশ করছি।

বর্তমান সরকারি আদেশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন সরকারি কোষাগার থেকে দেওয়া হয়। বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে বেশি শিক্ষক দেখিয়ে কোষাগার থেকে যে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে এমন একটি তথ্য ক্যাগ-এর রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছে। একটি নমুনা : (সারণী-১ দ্রষ্টব্য)

মোট ২৬২২টি স্কুল বেশি দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা খাতের থেকে বেশি টাকা তুলে অন্য বিভাগে খরচ করেছে কিন্তু খরচাটা শিক্ষা বিভাগে দেখিয়েছে। এতো শুধু চারটি জেলার খরচ অন্যান্য জেলাতে এক চিত্র।—

মিড-ডে-মিলেও জালিয়াতি করেছে সরকার — উদাহরণ : (সারণী-২ দ্রষ্টব্য)

মিড ডে মিল বেশি তুলে স্থানীয় স্তরে সস্তায় বিক্রী করেছে। ফলে চাষীরা সরকারি নির্ধারিত দামে ধান বিক্রী করতে পারেনি। চাষী আত্মহত্যারও এটা একটা কারণ।

ছাত্ররা যথাসময়ে বই না পেয়ে বাইরের বাজারে বেশি দামে কিনতে বাধ্য হয়েছে। আসলে এই বইগুলি সরকারই ছাপিয়ে ছিলেন ছাত্রদের জন্য বিনা পয়সায় বিলি করার জন্য।

ক্যাগ-এর এক তদন্ত কমিটি নদীয়া জেলার ১২টি স্কুলে পরিদর্শনে গিয়ে জানতে পেরেছেন মাত্র ৫টি স্কুল চালু আছে। বাদবাকি ৭টি স্কুল চালু নেই ডি এস সি কারণ হিসাবে ক্যাগ-এর অডিট স্টাফ-কে

সারণী-১

জেলা	স্কুল দেখানো হয়েছে	তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে স্কুল আছে	বেশি স্কুল দেখিয়ে বেতন তুলে নিচ্ছে
মেদিনীপুর	৯৫১৪	৭৭১৯	১৭৯৫
মালদা	১৯৬৮	১৮৭৭	৯১
উঃ ২৪ পরগণা	৪১৭৫	৩৬১৬	৫৫৯
নদীয়া	২৬২৭	২৪৫০	১৭৭
মোট	১৮২৮৪	১৫৬৬২	২৬২২

বলেছেন ছাত্র অনুপস্থিতির জন্য স্কুল বন্ধ কিন্তু স্কুল বাবদ খরচ প্রতি সালে তোলা হয়েছে।

অডিট স্টাফ জানতে পেরেছে ডি পি এস সি সরকারি নিয়মে অগ্রাহ্য করে ১.৩৬ কোটি টাকার স্টিল আলমারি কিনেছেন।

কমিটি আরও রিপোর্ট করেছেন রাজ্য সরকার মাসিক রিপোর্ট জমা দিতে না পারার জন্য রাজ্যের ৬১.১৬ লাখ ছাত্র ১ থেকে ৯ মাস মিড-ডে-মিল থেকে বঞ্চিত ছিল।

ক্যাগ রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার সর্বক্ষেত্রেই সরকারি টাকা সঠিক ব্যবহার করেনি, ফলে রাজ্য আর্থিক দিক থেকে দুর্বল। তবু কাজ চালু রেখে বাজার থেকে ঋণ নিয়েছে, ফলে রাজ্যের ঘাড়ে বিপুল দেনা— আজ পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রতি দেনা ২২০০০ হাজার টাকা। যদি সরকার রাজস্ব না বাড়াতে পারে তবে রাজ্যে ৯.২৩ কোটি লোকের অবস্থা করুণ হবে।

ক্যাগ রিপোর্টে বলা হয়েছে রাজ্যের ডি আর ডি এ স্কিম-এ পরিবহণ বাবদ সরকার ২.৩২ কোটি টাকা নিয়েছে। কিন্তু ভাউচার দিতে পেরেছে মাত্র ৫১.৭৫ লাখ টাকার। রাজ্যের Principal Secretary Grant হওয়া টাকা পি এন ডি এর কাজের জন্য ১১৭.৫৭ কোটি টাকা তার থেকে ২১.৪১ কোটি টাকা রাজ্যের প্রশাসন খরচায় নিয়ে গিয়েছে— ফলে পি এস ডি-ই প্রোজেক্ট-এর কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

বাঁকুড়ায় রানিবাঁধ পঞ্চায়েত সমিতিতে আদিবাসীদের জন্য ৬ শয্যার একটি প্রাইমারি হেলথ সেন্টার তৈরি করা হয়েছিল ৫১.০৭

লাখ টাকায় এবং সিকিউরিটির জন্য আরও ১.৭৫ লাখ খরচ করেছেন কেন্দ্রিয় সরকার। কিন্তু রাজ্য সরকার তা চালু করেনি। পোড়ো বাড়ির মতো রইল সেই আদিবাসীদের জন্য তৈরি হেলথ্ সেন্টারটি। আদিবাসীরা হলো ক্ষিপ্ত। জি ডব্লিউ ডি দপ্তরে ১৭৭৮ টন সিমেন্ট কেনা হয়েছিল। ঠিক সময়ে ব্যবহার না করার জন্য সমস্ত সিমেন্ট অকেজো হয়ে যায়। ক্ষতি হয় ৪৪.০৩ লাখ টাকা।

ক্যাগ কমিটি বলেছে চলতি বছরে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড হিসেবে ৩৪৪০৫ লাখ টাকা ঘাটতি হয়েছে ভুল এস্টিমেট জমা দেওয়ার জন্য।

ক্যালকাটা স্টেট ট্রানসপোর্ট করপোরেশন চালু রেখেছে ৪২০.৬৩ কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে—

ঠিক সময়ে প্রকল্প চালু করতে না পারার জন্য জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে সরকার ১৬৬.২৭ কোটি টাকা লোকসান করেছে। -

ক্যাগ রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার সর্বক্ষেত্রেই সরকারি টাকা সঠিক ব্যবহার করেনি, ফলে রাজ্য আর্থিক দিক থেকে দুর্বল। তবু কাজ চালু রেখে বাজার থেকে ঋণ নিয়েছে, ফলে রাজ্যের ঘাড়ে বিপুল দেনা—আজ পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রতি দেনা ২২০০০ হাজার টাকা। যদি সরকার রাজস্ব না বাড়াতে পারে তবে রাজ্যে ৯.২৩ কোটি লোকের অবস্থা করুণ হবে।

গত সরকারের আর্থিক সঙ্গতি হারাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ এক হতাশাগ্রস্ত রাজ্য হয়ে পড়েছে।

সারণী-২

জেলা	ছাত্র আছে (লাখ)	ছাত্র হিসেবে মিড-ডে-মিল তুলেছে	?	বই তুলে নিয়েছে
উঃ ২৪ পরগণা	৭.৩৯	৮.০৪	”	৯.৪৯
মেদিনীপুর	১২.৯৩	১২.৪৫	”	১২
নদীয়া	৫.২৭	জানা যায়নি	”	৬.৪০

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা সুন্দরবন ভ্রমণ করুন ....

বনভূমি ট্রাভেলস্

প্রো ঃ - মৃগাঙ্ক রায়

৯৭৩৪২০৬০৪০ / ৯৮০০৬৮৪২০১

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট,
ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩২৯
Email : banbhoomitravels@gmail.com

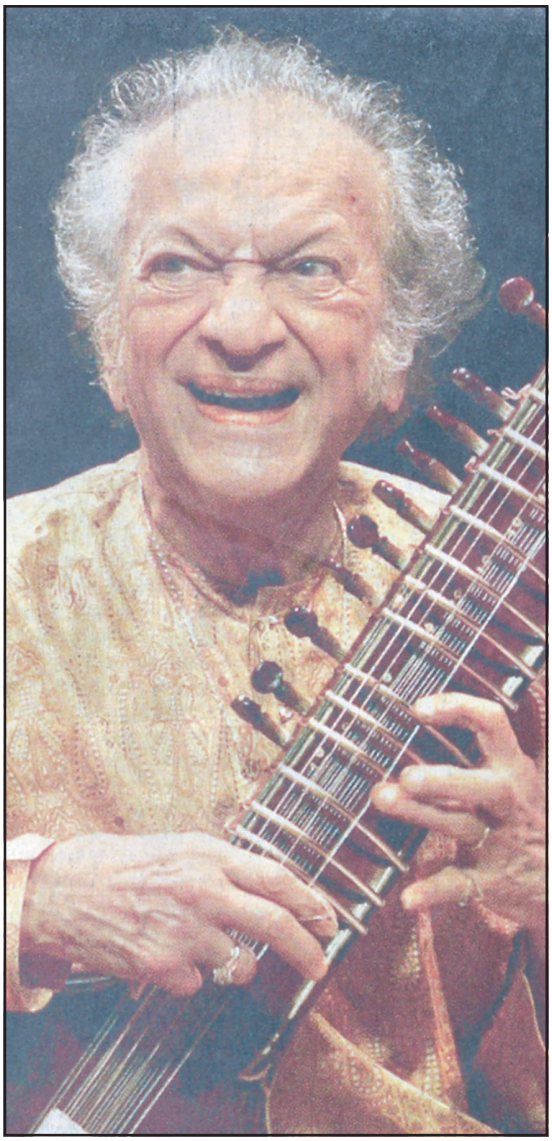

ভারতরত্ন রবিশঙ্কর

রমাপ্রসাদ দত্ত

'যে সঙ্গীত আমি নিজের জীবনে শিখেছি, যে সঙ্গীত আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে চাই, তা আসলে ঈশ্বরকে উপাসনার মতো। তার সঙ্গে প্রার্থনার কোনও ফারাক নেই।' বলেছিলেন রবিশঙ্কর। সেতার তাঁর জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল সত্তর বছরের বেশি সময়। শ্যামশঙ্কর চৌধুরী-হেমাঙ্গিনী চৌধুরীর কনিষ্ঠ সন্তান রবিশঙ্কর। জন্ম বারাণসীতে ১৯২০ সালের ৭ এপ্রিল। দাদা উদয়শঙ্কর তাঁর থেকে কুড়ি বছরের বড়। মাঝে দুই দাদা রাজেন্দ্রশঙ্কর, দেবেন্দ্রশঙ্কর। একসময় উদয়শঙ্করের নাচের দলে চারভাই-ই অংশ নিতেন। রাজেন্দ্র বাঁশি বাজাতেন। দেবেন্দ্র নাচতেন উদয়শঙ্করের সঙ্গে। রবিশঙ্কর ১১ বছর বয়সে মঞ্চে এসেছেন নৃত্যশিল্পী হিসেবে। এদেশে নয় প্যারিসে। সংগীতসাধক আলাউদ্দিন খাঁ তখন ছিলেন উদয়শঙ্করের নাচের দলে। কয়েক বছর বাদে রবিশঙ্কর নাচের বদলে যন্ত্রসংগীত অনুশীলনে মন দেন। গুরুর নিবাস মাইহারে সংগীত সাধনার অন্য পর্ব শুরু হলো। পায়ে ঘুঙুর বাঁধার বদলে তিনি সেতারের মধ্যে আকর্ষণ খুঁজে পেলেন। তারপর যা হয়েছে সবই ইতিহাস। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সত্যিকারের সংস্কৃতি দূত হিসেবে।

সংগীতের সাধনা চলে ধারাবাহিকভাবে। তাঁর সংগীতচর্চার তিনটি দিক ছিল : বৌদ্ধিক, শৈল্পিক, আবেগ। সুর তাল লয় জুড়ে থেকেছে তাঁর সংগীতচর্চার সমস্ত ক্ষেত্রে। তিনি শুধু স্রষ্টা নন, তিনি শিক্ষক। সংগীতের প্রচারক। ভারতীয় মার্গ সংগীতের সমৃদ্ধ রূপকে তিনি বিশ্বের সংগীত রসিকদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেক্ষেত্রে মিলেছে দারুণ সাড়া। বিদেশে সংগীতের দূত হিসেবে ঘুরতে হয়েছে তাঁকে। এদিকে তিনি কিছু শিল্পী তৈরি করেছেন, অন্যদিকে শ্রোতা তৈরি করেছেন। বিভিন্ন পর্বে ছড়িয়ে আছে তাঁর কাজ। সেতার পুরোপুরি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র। তা বাজানোর সময় সংগীতের অন্যান্য দিকেও তাঁর সচেতন দৃষ্টি ছিল। লতা মঙ্গেশকর বলেছেন, 'তিনি খুব ভালো গান করতে পারতেন— এটা অনেকে জানেন না।' বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাঁরা তাঁর সঙ্গে বাজাতেন তাঁদের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া ছিল তাঁর। যাঁরা তবলা বাজিয়ে ছিলেন প্রত্যেকে যথাযথ মর্যাদা পেয়েছেন। প্রত্যেকের সুবিধে অসুবিধে দেখেছেন। অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর ভাবনা প্রস্তুতি থাকতো সবসময়। তাঁর সেতার যাঁরা তৈরি করতেন তাদের সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক ছিল। সংগীত অনুশীলন, সংগীত প্রচার, সংগীতের প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিল যথাযথ।

সত্যজিৎ রায়ের অপু ত্রয়ী ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন তিনি। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার' অন্যরূপ নিয়েছে তাঁর সংগীত পরিচালনায়। পরেশপথের ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন তিনি। আরও অনেক ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছেন। প্রত্যেকটা অসাধারণ কাজ। দেশের প্রয়োজনে বিদেশে অনুষ্ঠান করে টাকা তুলে দিয়েছেন। বহুজনহিতকর কাজ সাহায্যের জন্যে বাজিয়েছেন। অথচ অনেকভাবে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। রয়ালিটি হিসেবে প্রাপ্য অনেক অর্থ পাননি। ভারতীয় সংগীতের জন্যে তাঁর কাজ চলেছে ধারাবাহিকভাবে। রবিশঙ্কর পনেরোটি ভাষা জানতেন। বলতেন। অথচ মাত্র অল্পদিন স্কুলে পড়েছেন। মানুষ হিসেবেও ছিলেন অনেক বড়ো। প্রকৃত অর্থেই ছিলেন ভারতরত্ন। ১২ ডিসেম্বর ২০১২-তে তাঁর জীবনাবসান। তাঁর মতো স্রষ্টার তো মৃত্যু হয় না। বিশ্বনাগরিক তিনি, প্রকৃত ভারতীয় তিনি। জীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। তাঁর সেতার আর বাজবে না। থাকবে শ্রবণস্মৃতি আর বিভিন্নভাবে ধরে রাখা তাঁর অসাধারণ সেতারবাদন। তাই-ই রয়ে যাবে গৌরবের উত্তরাধিকার হিসেবে।

চিঠিপত্র

সাচ্চা-মুসলিম তোষণ

সংবাদে প্রকাশ— "তৃণমূলের ক্ষতিতে লাভ তুলবে বিজেপি" ---এই আশঙ্কা সিপিএমের। সিপিএমের নেতাদের বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত সংখ্যালঘু তোষণের জন্যই রাজ্যে হারানো জমি অনেকটা উদ্ধার করতে পেরেছে বিজেপি। তাঁদের বিশ্লেষণ আগামী পঞ্চায়েত ভোটে এর জেরে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ভাল ফল করবে বিজেপি। প্রকাশ কারাত, বিমান বসু সাম্প্রদায়িকতার বিপদ নিয়ে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। প্রমাণ হিসাবে তাঁর জঙ্গীপুর উপনির্বাচনে বিজেপি-র ৮ শতাংশ ভোট পাওয়ার কথা বলছেন।

এবারে আসছি বামফ্রন্ট রাজত্বে ১৫.২.১১ তারিখে বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ—

মুখ্যমন্ত্রী নিউটাউনে আল আমিন মিশন একাডেমির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন। একই দিনে ১৩-২০ কোটি টাকা ব্যয়ে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগমের নিজস্ব ভবন অসম্পূর্ণ অবস্থায় উদ্বোধন করলেন। সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বললেন— আমরা—

১। সংখ্যালঘু দপ্তরের বরাদ্দ বাড়িয়ে ৬০০ কোটি টাকা করেছি।

২।মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ করেছি। এস সি /এস টি-র সংরক্ষণ হলে মুসলমানদের হবে না কেন?

৩।১৩.৪৫ লক্ষ মুসলমান ছেলেমেয়েকে ২২৩ কোটি টাকা বৃত্তি দিয়েছি।

৪। ১.৭৮ লক্ষ মুসলিম ছেলেকে ৪১৭ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছি ইত্যাদি।

বাম রাজত্বে এ জাতীয় সংবাদ হামেশাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোত।

এখন কোনটা সাচ্চা-মুসলিম তোষণ আর কোনটা অতিরিক্ত মুসলিম তোষণ তার মাপকাঠিটা কি?

বামনেতারা যদি সত্যি কথাটা বলতেন যে, আমরাও অতিরিক্ত মুসলমান তোষণ করেছিলাম। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা আমাদের ত্যাগ করে মমতাকে আশ্রয় করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাবধান। তাহলে সঠিক কথা বলা হোত।

বিজেপি-র একটা উপনির্বাচনে কিঞ্চিৎ ভোট বেড়েছে এজন্য এত উদ্বেগ? হিন্দুরা বঞ্চিত হতে হতে তাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে। এই সত্যটা বামনেতারা স্বীকার করুন।

—অম্বিকা প্রসাদ পাল, ঘোলাবাজার, কলকাতা-১১১।

কাসভের ফাঁসি

মুম্বই সন্ত্রাসের অন্যতম অভিযুক্ত আজমল কাসভের অবশেষে ফাঁসি হলো দীর্ঘ টালবাহানার পর। বস্তুত মুম্বইতে নৃশংস হত্যালীলার একমাত্র জীবিত পাক সন্ত্রাসবাদীকে এই কঠোর সাজা দিয়ে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দেওয়া গেল তা বলা যেতে পারে। তবুও এধরনের তাণ্ডব ও হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অপরাধীকে দীর্ঘদিন ধরে বিপুল অর্থব্যয়ে বহাল তবিয়তে আদর আপ্যায়ন করা অবশ্যই অযৌক্তিক। এধরনের সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি মানবিকতা প্রদর্শন না করাই শ্রেয়। অথচ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের ফাঁসির সময় যে ব্যগ্রতার সঙ্গে আইনি তৎপরতা দেখানো হয়েছিল তা বিস্ময়কর ব্যাপার। তাহলে শুধুমাত্র হিন্দু নিধনের জন্যই কি এই প্রশাসনিক তৎপরতা? কিন্তু ভারতীয় সংসদ ভবনে সন্ত্রাসবাদী হামলার অন্যতম নায়ক আফজল গুরুর ফাঁসির আদেশ দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর হয়নি। রাষ্ট্রীয় অপরাধের অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্যকর করতে প্রশাসনিক গাফিলতি কিসের ইঙ্গিত বহন করে? নাকি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী মুসলিম বলেই জামাই আদর করে দীর্ঘদিন কোটি কোটি টাকা খরচ করে যেতে হবে। আসলে হিন্দু নিধন যতটা সহজ মুসলিমদের ক্ষেত্রে তা ততটাই কঠিন। তাই মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ। এধরনের অপরাধীদের ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে। তাই জনগণের মনে আইন আদলত সম্পর্কে এক ধরনের অবিশ্বাস দানা বাঁধে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এঘটনাকে সমর্থন করা যায় না। তবুও আজমল কাসভের ফাঁসির ঘটনা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। দেরিতে হলেও এধরনের দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়াকে সাধুবাদ জানাতে হয়। তাই শুধু কাসভ নয় ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে যুক্ত যে কোনও সন্ত্রাসবাদীরই কঠোর সাজা হওয়া দরকার। নাশকতা কাজের সঙ্গে যুক্ত কাউকে মার্জনা করা গর্হিত অপরাধ। নৃশংস কাজের মতো নিন্দনীয় ঘটনা সমাজের কলঙ্ক। সন্ত্রাসবাদকে রুখতে হলে প্রশাসনিক তরফে এধরনের কঠোর পদক্ষেপ নেওয়াই দরকার। আর হত্যালীলার সঙ্গে যুক্ত হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই দরকার। অপরাধ জগতকে দমন করতে এছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। না হলে শুধু একটা 'কাসভের' ফাঁসির ঘটনা কোনও গুরুত্ব পাবে না।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

মূল্যায়ন

প্রীতিমাধব রায়

১৯৯০ সাল থেকে কয়েক বৎসর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাব কি তা আমাদের জানা উচিত এবং তা বুঝেই ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঠিক করা উচিত। এজন্য আমি সমাজের নানাস্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে তাঁদের মনোভাব জানতে চেষ্টা করি।

আমি যাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক করি, তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অন্য ধর্মের মানুষ, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ ইত্যাদি অনেকে ছিলেন এবং তার থেকে আমি জনমানসের একটি চিত্র পাই। তারই কিছু আভাস এখানে রাখছি। সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মতামতে সামান্য অংশই উল্লেখিত হচ্ছে। এইসব মতামত একান্তভাবে তাঁদেরই, এতে আমার ব্যক্তিগত মতামত নেই।

জনৈক উপাচার্য

আমি তাঁকে জানিয়েই গিয়েছিলাম যে আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে যাচ্ছি মাত্র, তিনি যদি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন তাহলেও আমি কিছু মনে করব না, বা কোনও বিতর্ক করব না। উপাচার্য মশায়কে লোকে প্রবল যুক্তিবাদী, সুতার্কিক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তি বলেই জানত। বর্তমানে তিনি প্রয়াত। দুঃখের বিষয় আমি যখন তাঁর গৃহে গেলাম তখন তাঁর বাড়িতে একজন মুসলমান চিত্রশিল্পী শিক্ষক ছিলেন, যাঁকে আমার সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলেই মনে হয়েছিল। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রবল বিরোধী এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছিলেন। আমি তাঁকে স্পষ্টই জানালাম যে, আমি তাঁর মতামত সম্বন্ধে আগ্রহী নই, আমি কেবল উপাচার্য মশায়ের মতামত জানতে এসেছি তাঁর পূর্ব অনুমতি নিয়েই। যদিও উপাচার্যমশায় যুক্তিবাদী ও স্পষ্ট বক্তা বলে খ্যাত তবুও দেখলাম, মুসলমান চিত্রশিল্পী থাকায় তিনি অতি-ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে পড়লেন এবং মুসলমান লোকটির উপস্থিতিতে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন এবং তথাকথিত বাবরী মসজিদ ভাঙার নিন্দা করলেন এবং কেবল হিন্দুস্বার্থ নিয়ে কাজ করার অসমর্থন করলেন। আমি সবিনয়ে নিবেদন করলাম যে, বাবরী মসজিদ কথাটিই ভুল, কারণ, প্রত্নতাত্ত্বিক যাবতীয় প্রমাণে এটি স্পষ্ট যে ওই গৃহটি নিশ্চিতভাবে শ্রীরামচন্দ্রের একটি মন্দির ছিল এবং প্রাচীন কাল থেকেই সরকারি নথিতে ওটি রামজন্মভূমি মসজিদ রূপে চিহ্নিত এবং ওটির পতনের সময়ে সরকারি আদেশে ও ব্যবহারে এটি মন্দির হিসাবেই চলছিল। তিনি সেকথা স্বীকার করলেন। অর্থাৎ আমি দেখলাম যে, যুক্তিবাদী বলে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে প্রতিপন্ন করা ও অন্যধর্মের প্রতি অতি সহানুভূতিশীল হওয়ার একটা চেষ্টা বজায় আছে।

আরও একজন উপাধ্যক্ষ

ইনি হিন্দু সমাজের জাগরণের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজ করার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপে স্বীকার করলেন। তবে বললেন, কাজ এমনভাবে করা উচিত যাতে সাম্প্রদায়িক বিবাদ এড়িয়ে যাওয়া যায়।

তৃণমূল কংগ্রেসের জনৈক নেতা

ইনি তৃণমূল কংগ্রেসের এক অতি দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন, বর্তমানে নেই এবং সম্ভবত উচ্চতম নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে বহিষ্কৃত। ইনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরোধিতা করলেন, কারণ স্বরূপ বললেন, কোন ধর্মের নামযুক্ত প্রতিষ্ঠানেরই তিনি বিরোধী।

অন্য একজন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা

ইতিপূর্বে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। বর্তমানে তাঁর দল থেকে নেতৃত্ব কর্তৃক অপসারিত তিনি বললেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থাকা দরকার। তবে তাঁর প্রধান কাজ হওয়া উচিত হিন্দুধর্মের সংস্কার, সমন্বয়, ব্যাপ্তি যে কাজ আচার্য শঙ্কর করেছিলেন। এখন আবার একজন শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব প্রয়োজন। আমি ভেবেছিলাম যে, রামকৃষ্ণ মিশন যে কাজ করতে পারবেন, কিন্তু তা হয়নি। তাঁরা নিজেরাই একটি সম্প্রদায় হয়ে গেলেন।

প্রয়াত প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো সাম্প্রদায়িক দলের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি কেবল নিন্দাই করলেন। আমি তর্কের মধ্যে বা আলোচনায় গেলাম না, কারণ, তাঁর শোনবার কোনও মনোভাবই ছিল না।

জনৈক উচ্চস্তরের চিকিৎসক

তথাকথিত বাবরী মসজিদ ভাঙার নিন্দা করলেন। বললেন যে, এতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা হিন্দুদের কোনও লাভ হয়নি বরং ক্ষতি। আমার সঙ্গে আলোচনার পর তিনি স্বীকার করলেন যে, অযোধ্যার ওই গৃহটি আগে রামমন্দির ছিল বলেই মনে হয়, তবে যেভাবে ওইটি ভাঙা হয়েছে, সেটি কৌশলগত ভুল। এতে বেশীরভাগ মানুষের মনে খারাপ প্রভাব পড়েছে। এবং হিন্দু আন্দোলনের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয়েছে। তিনি বললেন, হিন্দু জাগরণের প্রয়োজন আছে। তবে তা শান্ত ও গঠনমূলক দিক দিয়ে, সুবিবেচনা করে করা উচিত।

শ্রীরামপুরের মিশনারি কলেজের খৃস্টান অধ্যক্ষের মনোভাবের কথা 'জনসম্পর্ক' নামক লেখাতে আগেই লিখেছি। তিনি বলেছেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থাকা দরকার, কিন্তু তার প্রধান কাজ হওয়া উচিত, হিন্দুধর্ম ও সমাজের যাবতীয় ত্রুটি দূর করে এক আদর্শ ধর্ম ও সমাজ গড়ে তোলা।

একটি শ্রীরামকৃষ্ণ ধারার আশ্রমের অধ্যক্ষের মত হলো, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রধান কর্তব্য হোক আগে হিন্দুদের মধ্যে মহান অধ্যাত্ম ভাবনা এবং প্রকৃত ধর্মপরায়ণতা গড়ে তোলা। সবাইকে যদি নীতিপরায়ণতা ও ধর্মপরায়ণতার দিকে কিছুটাও নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে সামগ্রিক সামাজিক ও নৈতিক আবহাওয়া নির্মল হবে। সৎ ও সমাজমুখী, ঈশ্বর বিশ্বাসী ও সেবাপরায়ণ হিন্দুসমাজ গড়ে তুললে দেশের সামগ্রিক অবস্থাই বদলে যাবে। এ সম্পর্কে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির এক অগ্রণী ভূমিকা থাকা দরকার।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে সামগ্রিক ভাবে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে ধর্মপ্রাণ ও উদার করে গড়ে তোলাটাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রধান কাজ হোক এটাই জনগণ চান। নিঃসন্দেহে উগ্রতার থেকে ধর্মপ্রাণতার পথ বিশ্বহিন্দু পরিষদ তথা সংঘ পরিবারকে জনপ্রিয় করে তোলার ও সমগ্র জাতির মানবিকতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

তীর্থকথা

বিবেকানন্দের জন্মের দেড়শো বছরে চলুন কন্যাকুমারী

নবকুমার ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে কন্যাকুমারী। এর বাঁয়ে বঙ্গোপসাগর, ডাইনে সিন্ধু বা আরব সাগর ও সম্মুখে ভারত মহাসাগর। শুধু পর্যটন মানচিত্রে নয়, স্থানমাহাত্ম্যেও কন্যাকুমারী অনন্য। যজুর্বেদে এর উল্লেখ রয়েছে। কন্যাকুমারীর প্রাচীন ইতিহাস হচ্ছে, রাজা ভরত তাঁর রাজ্য ভারতবর্ষকে নয় ভাগে ভাগ করে দেন তাঁর নয়জন সন্তানকে। তাঁর কন্যা কুমারী ভারতের এই দক্ষিণ সীমান্তে রাজত্ব করতেন। পুরাণ বলে, দক্ষিণের এক কুমারী কন্যা শিবকে পতি হিসেবে পাওয়ার জন্য ঘোরতর তপস্যায় ব্রতী হলেন। কিন্তু শিব সেই কন্যাকে বিবাহ করতে রাজী হলেন না কিছুতেই। সেই থেকে তিনি কুমারীদেবী। কন্যাকুমারীর সমুদ্রবেষ্টিত একটি শিলায় ভারতের অন্যতম মহান মানব স্বামী বিবেকানন্দ ভারতমাতার ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন ১৮৯২ সালের ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর। কন্যাকুমারী এলাকার নবীন রূপকার হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ একনাথ রাণাডে। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় বিবেকানন্দ শিলাস্মারক মন্দির ও বিবেকানন্দ পুরম্।

কীভাবে যাবেন :

প্রতি সোমবার হাওড়া থেকে বিকেল ৪-১০ মিনিটে ছাড়ে ১২,৬৬৫ কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস। ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর রিজারভেশন সহ ৫৮৬ টাকা। এছাড়া চেন্নাই থেকে বাসে বা ট্রেনে কন্যাকুমারী যাওয়া যায়। প্লেনে ত্রিবান্দ্রম এয়ারপোর্ট নেমে গাড়ি বা বাস ধরে যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন :

স্বয়ংসেবকও তাঁদের পরিবারের জন্য মনোরম পরিবেশে বিবেকানন্দ-পুরম-এ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ঘরভাড়া ১০০ টাকা থেকে আরম্ভ। এই পুরমে খাওয়ার জন্য হোটেলও রয়েছে। বাঙালীদের জন্য কন্যাকুমারীতে বাঙালী হোটেলে মাছেরও ব্যবস্থা রয়েছে। থাকার জন্য যোগাযোগ : বিবেকানন্দ কেন্দ্র। বিবেকানন্দ পুরম। কন্যাকুমারী ৬২৯৭০২, ফোন : ০৪৬৫-২৪৭০১২।

web : www.vivekanandakendra.org.

বিবেকানন্দ কেন্দ্রের কলকাতা কার্যালয় থেকেও অনুমতি পাওয়া যেতে পারে। যোগাযোগ : ফ্ল্যাট এক্স-৩, দ্বিতীয়তল। ৭৬/২ বিধান সরণি। কলকাতা-৬। ফোন : ০৩৩-২৫৫৫-৮২১৭।

কী দেখবেন :

কন্যাকুমারীর মন্দির। ভোর ৪-৩০ মিনিটে মন্দির খোলে। দেবীর মহাঅভিষেক ও অলঙ্কার শৃঙ্গার দেখতে হলে টিকিট কাটতে হবে যথাক্রমে ২৫০ ও ১০০০ টাকার।

কন্যাকুমারী থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে ভাট্টাকোট্টাই। অষ্টাদশ শতকে তৈরি নৌবাহিনীর ব্যারাক। ফোর্টটি গ্রানাইট এর ব্লক দিয়ে তৈরি। যদিও এর বেশির ভাগটাই আজ সমুদ্রগর্ভে, তবুও এখানকার নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয়। যাওয়ার জন্য অটো রিকশো বা গাড়ি ভাড়া মেলে।

চলে যান কন্যাকুমারী থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে মরু ও বামলৈ পাহাড়ে। প্রবাদ রয়েছে রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় হনুমান গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে যাওয়ার সময় পাহাড়ের খানিকটা অংশ এখানে ভেঙে পড়ে। সেখান থেকেই এই পাহাড়ের উৎপত্তি। কেউ কেউ এক হনুমান পাহাড়ও বলে। যাওয়ার জন্য অটো ভাড়া মেলে।

যে জন্য কন্যাকুমারী যাওয়া তার জন্য লঞ্চে করে চলে যান বিবেকানন্দ শিলা মন্দিরে। এই সেই পবিত্র ক্ষেত্র যেখানে স্বামীজী ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ধ্যানগৃহে বসে আপনি প্রার্থনা জানান আগামীদিনের দেশের জন্য।

কন্যাকুমারী থেকে বাসে রামেশ্বরম্ যাওয়া যায়। যেতে পারেন ত্রিবান্দ্রম, কালাডিতে শঙ্করাচার্য মন্দির।

যজুর্বেদের কথা

রবীন সেনগুপ্ত

যজুর্বেদ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ। কৃষ্ণযর্জুবেদের অপর নাম তৈত্তরীয় সংহিতা। শুক্ল যজুর্বেদের একটি শাখার নাম হলো বাজসনেয়ি সংহিতা।

শুধু ভগবানের কৃপাতেই সব হয় না। কৃপার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যক্তি ও অন্যান্যদেরও সাহায্য প্রয়োজন হয়— এই বাস্তব বেদ বাক্যটি যজুর্বেদ-এর একটি স্তব থেকেই মানব সমাজে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয়। স্তবটি দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকের চতুর্থ ও পঞ্চম স্তব।

রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে অতি পরিচিত ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতটি হলো— সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে। এই

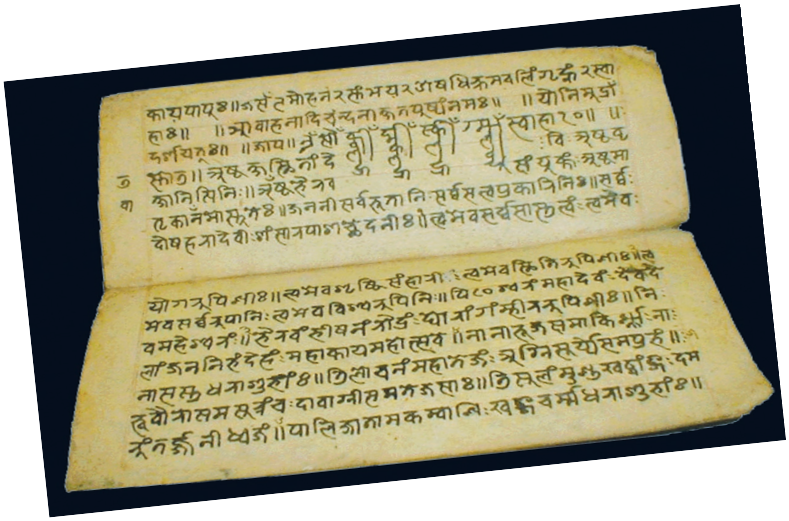

মুখরাটির উৎস হলো যজুর্বেদেরই প্রথম কাণ্ড চতুর্থপ্রপাঠক এর ৩৪ তম স্তব। সংস্কৃত ভাষায় সেই স্তোত্রটির প্রথম পঙক্তিগুলি এইরূপ : জ্যোতিস্মতীং ত্বা সাদয়ামি জ্যোতিস্কৃতং ত্বা সাদয়ামি... ভাস্বতীং ত্বা সাদয়ামি জলন্তীং... বোধয়ন্তীম ত্বা সদেয়ামি জাগ্রতীং... ইত্যাদি।

সূর্যই এই জগতের সকল প্রাণের উৎস— এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি শুক্ল যজুর্বেদের ১৩ তম অধ্যায়ের দশম মন্ত্রটির এক স্থানে পাওয়া যায়। সেই বিজ্ঞানময় শ্লোকাংশটি এইরূপ : আহ প্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য আত্মা জাগতস্তস্থুষশ্চ।

নিরাকার ঈশ্বর যে সৃষ্টির পূর্বে দেহধারণ করেন এই আধ্যাত্মিক সত্যটি রয়েছে কৃষ্ণযজুর্বেদের চতুর্থ কাণ্ড প্রথম প্রপাঠকে। শ্লোকাংশটি এইরূপ— হিরণ্যগর্ভ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।

ভিনগ্রহগুলিকে মনুষ্যাকৃতির উন্নত সত্তাদের দেবতা বলা হয়। পৃথিবীতেও যোগ তপস্যা দ্বারা ঐ রকম দৈহিক ও মানসিক উন্নতি করতে পারলে তাদের দেবতার মত শ্রদ্ধা করতে হয়— এই সংক্রান্ত তথ্য বেদ ও পুরাণের নানা স্থানে রয়েছে। যজুর্বেদের একস্থানে বলা হয়েছে যে— মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের প্রতিদিন খাদ্যগ্রহণ করে ক্ষুধা মেটাতে হয়, সাধারণ দেবতাদের পনেরদিন অন্তর একবার করে ক্ষুধা মেটানোর জন্য খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। আরও উচ্চ দেবতাদের মাসে মাত্র একবার করে খাদ্য লাগে। (২য় কাণ্ড ৫ম প্রপাঠক, কৃষ্ণযজুর্বেদ)

যীশুখৃস্টের অপর নাম হলো ঈশা, একথা বাইবেলে রয়েছে। ঈশা একটি সংস্কৃত শব্দ। ঈশা মানে ঈশ্বর। এই যজুর্বেদে ঈশা শব্দটি দিয়ে একটি স্তোত্র শুরু হয়েছে— ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ...। যীশুকে শৈশব অবস্থায় যে প্রাচ্য দেশীয় সন্তগণ দেখতে গিয়েছিলেন তারা অবশ্যই এ দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং ঈশা নামটি সম্ভবত তাঁদেরই দেওয়া। পুরাণ শাস্ত্রে আমরা পরশুরামের পিতা হিসাবে যে জমদগ্নি মুনির কথা পাই সেই মুনির উল্লেখ রয়েছে এই যজুর্বেদেই— ত্র্যায়ুষং জমদগ্নে কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্ —এই শ্লোকটি রয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে।

হিন্দুধর্মে যে মন্ত্রদীক্ষার প্রচলন রয়েছে তার উল্লেখও আমরা পাই চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম স্তোস্ত্রটিতেই। শ্লোকটি এরূপ : দীক্ষাতপো-সোস্তনূরসি তাং ত্বা শিবাং শস্মাং পরিদধে ভদ্রং কর্ণং পূষ্যন্।।

পুরাণশাস্ত্রে গরুড়-এর বহুল উল্লেখ থাকলেও বেদে বিশেষ এর উল্লেখ নাই। যজুর্বেদের ১৭শ অধ্যায়ের ৭২ তম শ্লোকের একটি অংশে গরুড় এর উল্লেখ আমরা পাই— সুপর্ণোঽসি গরুত্মান পৃষ্ঠে পৃথিব্যাঃ সীদ।...

অনেকে বলেন যে বেদে যে সরস্বতীর উল্লেখ আছে তিনি নদী, তিনি দেবী নন। পুরাণে বেদের নদীটিই সরস্বতী হয়ে গিয়েছে।

তাদের এই সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সত্য নয়। তা আমরা যজুর্বেদ থেকেই বুঝতে পারি। যজুর্বেদের ১৯তম অধ্যায়ে ৮,১২ ও ২৬ তম শ্লোকে দেবী হিসাবেই সরস্বতীর নাম আছে— নদী হিসাবে নয়। পুরাণেও সরস্বতীকে আলাদা ভাবে দেবী এবং নদী উভয় হিসাবেই উল্লেখ করা আছে। যজুর্বেদের একস্থানে বলা হচ্ছে— দেবতারা ঔষধরূপ যজ্ঞ করেছিলেন— এখন অশ্বিনী কুমার দ্বয় ও সরস্বতী বাক্যের দ্বারা ভিষক রূপে অবস্থান করছিলেন— দেবা যজ্ঞমতন্বত ভেষজং ভেষজাঽশ্বিনা। বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াণি দধতঃ।।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের উল্লেখও যজুর্বেদের বহুস্থানে রয়েছে। যথা ষষ্ঠ কাণ্ডের তৃতীয় প্রপাঠক এর একটি মন্ত্রে বলছে— বৈষ্ণবার্চ্চা হুতা যূপমচ্ছৈতি বৈষ্ণবো বৈ দেবতয়া...। অথবা শুক্ল যর্জুবেদের ৫ম অধ্যায়ের ২০তম শ্লোকে— বিষ্ণো বরাটমসি বিষ্ণোঃ শ্নপ্ত্রে স্থো বিষ্ণোঃ সুরসি বিষ্ণোধ্রুবোঽসি। বৈষ্ণমসি বিষ্ণবে ত্বা।... ২৪তম শ্লোকে—বলগহনোঽহবস্তৃণামি বৈষ্ণবান। রক্ষোহনৌ বাং বলগহনা উপদধামি বৈষ্ণবী। রক্ষহনৌ বাং বলগহনৌ পর্যূহামি বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবা স্থ।

পরমাণুর উল্লেখও আমরা এই বেদে একাধিকবার পাই। কৃষ্ণযজুর্বেদের ৪র্থ কাণ্ডের ৫ম প্রপাঠকে বলা আছে— যিনি পরমাণু, ধূলি, কাষ্ঠ, আর্দ্র স্থান, তৃণাদিশূন্য স্থান ও তৃণদিতে জাত সেই রুদ্রের প্রতি আমি প্রণাম জানাই। নমোহ পরমানায় চাভিঘ্নতে চ নম আক্‌খিদতে চ প্রক্‌খিদতে চ... ইত্যাদি।

এমনই আরও অনেক কিছুই জানা যায় যজুর্বেদ গবেষণার মাধ্যমে।

সামবেদের প্রচার ও প্রসার

পরম্পরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গীতিকাব্যের মূর্চ্ছনা রয়েছে সামবেদে। ঋক্‌বেদের নির্যাস থেকে সামবেদের গীতের ঝঙ্কার। এই দুটি বেদের নৈকট্য রয়েছে। ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ ডেভিড ফ্রাউলি বলেছেন, ‘‘ঋক্‌বেদ যদি ছন্দোবদ্ধ শব্দ হয়, সামবেদ তবে গীতিকাব্য। ঋকবেদ যদি জ্ঞান হয় সামবেদ তবে তার উপলব্ধি। ঋক্‌বেদ যদি স্ত্রী সত্তা হয় সামবেদ তবে হলো পুরুষাকার।’’

সামবেদের বিষয়ে বেদজ্ঞ পণ্ডিত লোকের সংখ্যা এখন বেশি নেই। ধীরে ধীরে তাঁদের সংখ্যা কমছে। কিন্তু তা থেকে উদ্ধার পেতে দক্ষিণ ভারতের দুটো শঙ্কর মঠ— কাঞ্চীর শঙ্করমঠ ও শৃঙ্গেরীর সারদা পীঠ সামবেদ প্রচারে উদ্যোগ নিয়েছে।

কাঞ্চীর শঙ্করমঠ সারাদেশ জুড়ে বেদ ভাষ্যের উপর সমীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু ফল নিরাশাজনক। সামবেদ অভিজ্ঞ লোকের দেখা পাওয়া ভার। কাঞ্চীর শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতী ও বিজয়েন্দ্র সরস্বতী মঠের কার্যকর্তাদের ‘সামবেদ’-কে জনপ্রিয় করতে আলোচনা সভা ডাকতে বলেছেন। সেই অনুসারে গত ২৫ নভেম্বর, ২০১২-তে চেন্নাইতে সামবেদ নিয়ে আলোচনা সভা হয়েছে। কাঞ্চী মঠের চেন্নাই শাখাতে তা হয়েছে। সামবেদ নিয়ে আলোচনা সভায় এসেছেন পণ্ডিত, ছাত্র, অনুরাগীরা। রামচন্দ্রন কাজ করেন কর্পোরেট সেক্টরে আবার তিনি মঠের একজন স্বেচ্ছাসেবকও। অনেক পণ্ডিত বেদের নানা দিক নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের নগদ পুরষ্কার দেওয়া হয় বির্তকের মান দেখে। দুশোজন পণ্ডিত, দেড়শো ছাত্র এবং প্রায় দুশো অনুরাগী এই আলোচনাসভায় অংশ নেন। অনেকে বলেন, কর্ণাটকী গীতের ধারাটাই সামবেদের, অনেকে বলেন, সামবেদের ১০০০ শাখা ছিল, বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৩টি শাখা। দক্ষিণ ভারতে কাউথোমা শাখা চর্চা হয়ে থাকে। মানব সভ্যতার প্রথম গীতি সাহিত্য সামবেদ। সামবেদ পূর্ব ভারতে যথা পশ্চিমবাংলায় বহু চর্চিত বিষয় ছিল। সামবেদের বিকাশভূমি পশ্চিমবাংলা। তাই ভারতের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মঠের কর্মকর্তারা।

মানব সভ্যতার প্রথম গীতি সাহিত্যই সামবেদ। সামবেদে সঙ্গীত, মন্ত্র, ছন্দ, স্বরলিপির সমাহার। সর্বোপরি ঋষিদের ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা যা তারা আর্য ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। এই আর্য ভাষা হলো সুসংহত গিরবন ভাষার প্রতিরূপ যা পরে সংস্কৃত নামে অভিহিত হয়।

চেন্নাইতে চতুর্মাস ব্রত পালনের সময় ‘‘শৃঙ্গেরী সারদা পীঠ ৬০ জন পণ্ডিতকে শ্রী ভারতী তীর্থ সামীঙ্গল সম্মানিত করে। ১০০ বৎসরের প্রাচীন শৃঙ্গেরীর ‘পাঠশালায়’ বহু ছাত্রকে চারিটি বেদের শিঙ্গা দেওয়া হয়। একথা জানান মঠের ভি কল্যাণ। এছাড়া ব্যাঙ্গালোর ও কালাডির মঠ গবেষণা কেন্দ্রে বেদের বিভিন্ন দিক নিয়ে চর্চা হয়ে থাকে।

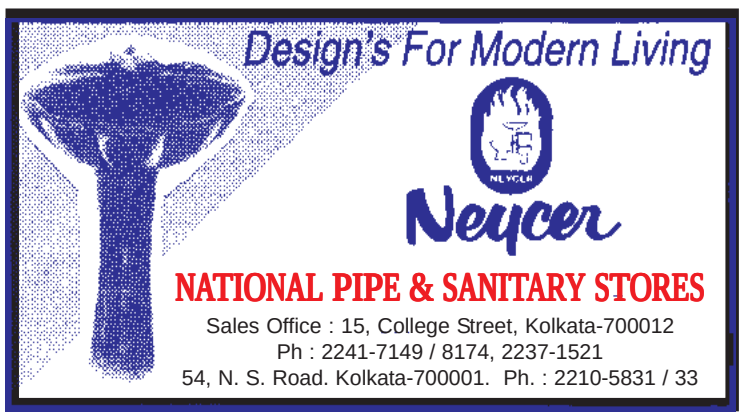

ছোটোদের চিঠি লেখার আসর

হোতু কোনওসময়েই বিজ্ঞানের বিপক্ষে কথা বলে না। তবে এটা স্পষ্টভাবে জানায়, জীবনকে যান্ত্রিক আর প্রাণহীন করা বিজ্ঞানের কাজ নয়। ওইরকম কাণ্ড করেছে বেশি-বোঝা কিছু মানুষ। জীবনকে সহজ করার জন্যেই বিজ্ঞানের এত আবিষ্কার। দোষ বিজ্ঞানের নয় মানুষের। হোতু এসব নিয়ে আলোচনা করে আনন্দ পায়। মাঝে মাঝে তার কাছে আসে শুভশঙ্কর মুখোপাধ্যায় আর বিনায়ক রুদ্র। দুজনে দুটো স্কুলে পড়ায়। শুভশঙ্কর পড়ায় গণিত। আর বিনায়ক বাংলার শিক্ষক। দুজনেরই নানা বিষয়ে আগ্রহ। খুব পড়ার অভ্যেস। শুধু পড়া নয় তা হজম করে ভালোভাবে। কোতুর মতো সবজান্তা বাহাদুর সেজে তড়বড়িয়ে কথা বলে না। কোতুর অভ্যেস একটু পাল্টেছে হোতুর পাল্লায় পড়ে। কোতু ছাড়াও আরও কয়েকজনের মধ্যে দেখেছে স্বল্পবিদ্যের ফড়ফড়ানি। দুচারটে বই উল্টে পাল্টে, ঠিকমতো না পড়ে বিদ্যে জাহির করে। তার সঙ্গে ইদানিং যোগ হয়েছে কমপিউটার ইনটারনেট। সেসব নিয়ে খেলা করে এমনভাব দেখায় যেন কত জানে। শুভশঙ্কর বলে, 'ছোটোদের আমি সবসময় বলি বই পড়ো, কাগজপত্র দেখো, চিঠি লেখো। তাতে পেয়ে যাবে অনেককিছু। এছাড়া বাবা-মা, বন্ধু আর শিক্ষকদের কাছে শেখা যাবে।' বিনায়ক বলে, 'কৃত্রিম শিক্ষা নয়, আসল শিক্ষা চাই।' কৃত্রিম শিক্ষা ব্যাপারটা সহজ করে সে বলে দেয়, 'যেসব জায়গা থেকে সহজে কিছু জ্ঞান মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলছো তার মধ্যে কষ্ট করে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার ব্যাপারটা না থাকায় ফাঁক রয়ে যাচ্ছে।'

হোতু বলল, 'তোমরা ভাবছো অনেক ব্যাপারে। ছোটোদের ঠিকভাবে বড়ো করে তোলার জন্যে খুব চিন্তা করো দুজনেই। আমি তোমাদের কথা মন দিয়ে শুনি। নতুন কিছু জানা শেখার আনন্দ পাই। আমার মত, তোমরা এই ধরনের ভাবনাগুলো লিখে ফেলতে পারো। কোনও-না-কোনও কাগজে ছাপা হলে অনেকে পড়বে। তোমাদেরও ভালো লাগবে। দুজনেই বলেছে, 'আপনার পরামর্শ মনে রাখার চেষ্টা করবো হোতুদা।' তার কথা দুই তরুণ শিক্ষকের পছন্দ হয়েছে দেখে খুশি হলো হোতু। হাসল।

তারপর বলল, 'আমরা একটা কাজ করতে পারি না কি একটু ভেবেচিন্তে?' শুভশঙ্কর আর বিনায়ক জানতে উৎসুক। হোতু বলল, 'এখন চিঠি লেখার অভ্যেস খুব কমে গেছে। যারা লিখছে তারা শুধু কাজের চিঠি লিখছে। কারণ অকারণে চিঠি লেখার অভ্যেসটি হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকঘরের লোকজনও বলছে চিঠির আসা-যাওয়া কমে গেছে। আমি কদিন আগে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' উপহার দিলাম এক নাতনিকে। সে পড়ে দারুণ খুশি। জানাল, 'এরকম চিঠি লেখার জন্যে যে মন দরকার তা হারিয়ে গেছে।' বললাম তাকে, 'তোর ভালো লাগাটা আমাকে চিঠি লিখে জানা।' সে বড়ো চিঠি লিখছে। দু তিনটে বানান ভুল ছাড়া দারুণ। পড়ে দেখো তোমরা। ওই চিঠি নিয়ে আমরা কিছু করতে পারি না? নতুন বছরের আগে একটা করে চিঠি লিখবে ছোটোরা। দল বেঁধে লেখার প্রতিযোগিতা।'

শুভশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'দারুণ ভেবেছেন।' বিনায়ক ততক্ষণে হোতুর নাতনির চিঠি পড়া শেষ করে বলল, 'এটাও দারুণ।' শুভশঙ্কর বলল, 'আমিও পড়ছি।' বিনায়ক বলল, 'চিঠি লেখার প্রতিযোগিতায় যে কোনও বিষয়ে লেখা যাবে। সময় থাকবে এক ঘণ্টা। কারও তার বেশি লাগলে আপত্তি থাকবে না। সাদা আর রুলটানা দুরকম ভালো কাগজ থাকবে। তবে পরীক্ষার কাগজের মতো নয়। পরীক্ষা-পরীক্ষা ভাবটাও থাকবে না।' শুভশঙ্কর বলল, 'চিঠি লেখা প্রতিযোগিতা নয়, আমার মতে ওটা চিঠি লেখার আসর হলে ভালো।' হোতু বলল, 'ঠিক আছে। তোমরা দিনক্ষণ ঠিক করো। যারা যোগ দেবে প্রত্যেককে আমরা পুরস্কার দেবো। কিছু খাবারও থাকবে।' হোতু তাকাল চিকলির দিকে। চিকলি বলল, 'দিচ্ছি।' প্লেটে প্লেটে সে প্রত্যেককে দিল পিঠে। পাটিসাপটা। বিনায়ক বলল, 'দারুণ চিঠি। আর চাপাটি নয়, পাটিসাপটা।' অর্জুন এসে গেছে এর মধ্যে। আলোচনার মূল কথা জানিয়ে দিল হোতু। সেইসঙ্গে বলল, 'পাটিসাপটা এসেছে অর্জুনের বাড়ি থেকে।' পনেরোদিন বাদে এক রবিবার সকাল নটায় শুরু হলো চিঠি লেখার আসর। খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। ছোটো ছোটো টেবিল চেয়ার। কিছু গাছ ফুল ছিল। চিঠি লেখার আসর দেখার জন্যে এসেছে অনেকে। লেখা শুরুর সময় মাইক্রোফোন বন্ধ থাকবে। ধারে কাছে কেউ যাবে না। ছোটোদের কোনও প্রয়োজন হলে অবশ্যই কেউ-না- কেউ এগিয়ে যাবে। অভিভাবক আর দর্শকদের বলা হলো, কথাবার্তা বলবেন না নিজেদের মধ্যে। ১৬০ জন অংশ নিয়েছে। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ে। অর্জুন ছবি তুলছিল ঘুরে ঘুরে। ছোট্ট ছোট্ট পত্রলেখকদের নানারকম মেজাজ বা মুড ধরতে চাইছিল। সবশেষ হতে কয়েকজন অনুরোধ করলো, 'প্রতিবছর এরকম আসর করুন আপনারা।' হোতু বলল, 'মনে রাখবো প্রস্তাবটা।'

কৌশিক গুহ

বইয়ের টানে

বইয়ের যত্ন চাই রোজই

ঘর পরিষ্কার বছরে তিনবার হয় খুব ভালোভাবে। রোজই সাফসুতরো হয়। তবে অনেকটা উপর উপর। জিনিসপত্র সরিয়ে নাড়িয়ে পরিষ্কার হয়ে ওঠে না। খাটুনি তো কম নয়। এখন ধুলো বাতাসে ওড়ে খুব বেশি। গ্রাম শহর সব জায়গাতেই। রিয়াকে বাবা বলেছে, 'নিজের পড়ার টেবিল নিজে গুছিয়ে রাখবে। বই খাতাপত্র সব ঠিকভাবে ঠিক জায়গায় রাখবে। স্কুলের ব্যাগ গোছানোর দায়িত্ব নিজের। যা যা দরকার সব নেবে। জল টিফিন নিতে ভুলবে না।' রিয়া গুছিয়ে রাখে। তবে মা গুছিয়ে রাখলে ভালো লাগে। একটু বড়ো হয়েছে, মা মাঝে মাঝে খাইয়ে দিলে খুব আনন্দ পায় রিয়া। বাবা এখনও তার জুতোর ফিতে বেঁধে দেয়। দাদার চুল মা আঁচড়ে দেয়। প্রতিদিন খেলে মাঠ থেকে ফেরার পর মার কাছে শোনে, 'জামা-প্যান্ট পাল্টা। হাত পা ধো।' দাদা একটু এলোমেলো রাখে বইপত্র। মা গুছিয়ে দেয়। এটা ওটা সেটা খুঁজে পায় না দরকারের সময়। বোনকে জিগগেস করে, 'তুই নিয়েছিস?' রিয়া বলে, 'খোঁজ, পেয়ে যাবি। তুই-ই রেখেছিস।' এরকম হয় রোজই। মা তবু বলে, 'নিজের বইপত্র ঠিকমতো রাখা চাই সবসময়।' ঘর পরিষ্কার হয় চৈত্রের শেষে। তার মানে নতুন বছর আসার আগে। পুজোর আগে আরেকবার। ডিসেম্বরের শেষেও পরিষ্কার হয়। তবে খুব বেশি নয়। ধুলোটুলো ঘেঁটে ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকে। তিনবারই বাবা নিজের বইপত্র গোছায়। বাবাকে সাহায্য করে রিয়া। দাদাও খুব খাটে। বাবা খুব যত্নে রেখেছে পুরনো বই। যেগুলো দাদু-ঠাকুমা আরও অনেকে ব্যবহার করেছিল। রিয়া যখন লিখতে পড়তে শেখেনি, খাতা পেলে কলম আর রঙ নিয়ে কতকিছু লিখত আঁকত। সেরকম একটা খাতা বাবা খুব যত্নে রেখেছে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. বিশ্বের ফুসফুস কাকে বলা হয়? 'আন্তর্জাতিক অরণ্য বর্ষ' কবে ছিল?

২. বনের সব থেকে ক্ষতি কীভাবে?

৩. বন্যপ্রাণীরা মানুষের উপর আক্রমণ করে কেন?

৪. বনসংহারের বড় কারণ কি? কি হচ্ছে?

৫. ২০১৩ থেকে ভারতে বননাশ ও বনসৃজন কীভাবে নজরদারির পরিকল্পনা আছে।

উত্তর : ১. বনকে। ২০১১। ২. অগ্নিকাণ্ডে। ৩. বনে খাবারের অভাব হলে। ৪. জনবসতি বিস্তার। বন কেটে বাস ও চাষবাস। ৫. এদেশের নিজস্ব উপগ্রহ মারফত হবে।

ছবিতে তফাত খোঁজা

উলটো পালটা

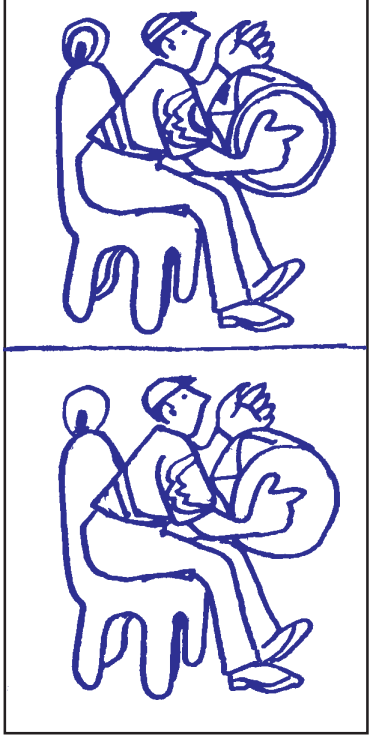

সবসময় মুখ বাঁকিয়ে রাখা অভ্যেস মোহিনী রাহার। কারও সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলা তাঁর ধাতে নেই। স্কুলের পাশে তাঁর বেশ বড় বাগান। ফলের গাছ অনেক। কদিন আগে মোহিনী স্কুলে হাজির একটা পেয়ারা ডাল নিয়ে। হেডমাস্টারমশাইকে বললেন, 'আপনার স্কুলের ছেলেরা আমার বাগান রাখতে দেবে না দেখছি। পেয়ারা গাছে উঠে ফল পেড়েছে, ডাল ভেঙেছে।' হেডমাস্টারমশাই চুপ করে শুনলেন। একটু দূরে বসে ছাত্রদের কি একটা কাজ করছিলেন অজয়-স্যার। তিনি একথা শুনে বললেন, 'রাহাবাবু, আপনার আর গৃহিণীর দাঁত নেই, নাতিনাতনিরাও থাকে না। পেয়ারাগুলো কাকপক্ষী খাওয়ার থেকে ছেলেরা খেলে আপনার আপত্তির কি থাকতে পারে! বিনা ইনভেস্টমেনটে খানিকটা পুণ্যও হয়ে যাবে তাতে।' ঘরের সবাই হেসে উঠলেন। রাহাবাবু রেগেমেগে উঠে পড়লেন পেয়ারা ডাল হেডস্যারের কাছে রেখে।

২

বরাবরই খাওয়ার লোভ একটু বেশি মানিক দাসের। কোনও জায়গায় নিমন্ত্রণ থাকলে ভাবে কোন্ কোন্ খাবার বেশি খাবে। এখন ইচ্ছেমতো চেয়ে নিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ হয়েছে। বুফেতে গিয়ে মানিক

একগাদা মাংস মাছ খেয়ে নেয়। তারপর যত পারে মিষ্টি খায়। ছাঁদা বাঁধার সুযোগ নেই। অথচ সবসময় তার ইচ্ছে হয় দু-চারটে ফিশফ্রাই কিংবা গোটা পাঁচেক সন্দেশ পকেটে ভরে নিয়ে যায়। রাত দুপুরে সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর খাবে। মানিক তালে থাকে। সুযোগ পেতেই চাদরের আড়াল করে পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। গণপতি ঘোষের বিয়ের দিন লুকিয়ে মাছ খাওয়ার সময় ধরা পড়ার পর বলে 'বেড়ালটা ঘরে ছিল। ওকে মাছ দিলাম।' রমেন বলল, 'বেড়াল কি কাঁটা বেছে খায়? আপনার গোঁফে মাছের কাঁটা।' সেই থেকে নাম হয়েছে 'মেছো-মানিক'।

রামগরুড় সংকলিত

যীশুপুজোয় মহিলাদের ভূমিকা

মিতা রায়

উৎসব মানেই সম্প্রীতির উৎসব। সকল জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আনন্দ করার উৎসব। তাই বাঙালির উৎসবের দিনগুলোর সঙ্গেই যীশুখৃস্টের জন্মদিনটাও (২৫ ডিসেম্বর) পালন করা হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে। এ ব্যাপারে হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে, যীশুর জন্মদিন তো পালন করবে খৃস্টানরা। ঠিক কথা। কিন্তু হিন্দুরা যীশুকে একজন মহান মানুষ হিসেবেই শ্রদ্ধা করে। আমাদের দুর্গাপুজোর মতোই কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে ওদের উৎসবের সঙ্গে। মানবপ্রেমের ঈশ্বর যীশুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। তিনি ছিলেন মানবতার ও প্রেমের পূজারী।

আমাদের পরিচিত অসীমাদির কাছে জানতে চাইলাম যীশুর জন্মদিনে খৃস্টান মহিলারা কী ধরনের উৎসবের আয়োজন করেন?

এই উৎসব চলে তিনদিন ধরে। ঘরে ঘরে যীশুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা, নানারকমভাবে ঘর সাজানো, বিভিন্ন ধরনের কেক তৈরি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা জানানো। যেসব বাড়ির গৃহকর্তা, ছেলেমেয়েরা কর্মসূত্রে বা শিক্ষার্থী হিসেবে বাইরে থাকেন, তাঁরা সকলেই বাড়ি ফিরে আসেন উৎসবের দিনে। অসীমাদির পাড়ার এক খৃস্টান মহিলার কাছে বড়দিন উৎসব পালন সম্পর্কে জানা গেল--- ছোটবেলায় আমাদের গ্রামে দেখতাম, বড়দিনের আগের দিন, অর্থাৎ চব্বিশে ডিসেম্বর থেকেই বাড়ির মা, দিদিমা ও অন্যান্যরা কেক তৈরি করতে লেগে যেতেন। ঘরদোর পরিষ্কার করে সাজানোর কাছে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তবে দুর্গাপুজোয় আপনাদের মতো নতুন জামা কাপড় পরার রীতি আমাদের নেই; তবে কেউ যদি পরতে চায় পরতে পারে।

এই দিনের উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, রাত্রিবেলা গির্জায় সপরিবারে গিয়ে যীশুর কাছে প্রার্থনা জানানো। গির্জায় ভেতরে সাজানো হয় আলো, মোমবাতি। যীশুর সামনে থাকে ময়দার তৈরি পাউরুটি ও কেক। গির্জা থেকে ফেরার সময়ে পাউরুটির টুকরো সংগ্রহ করে নেওয়া। প্রত্যেকে পেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করে পরস্পরকে। আমাদের মন্দিরে পুজো দিয়ে যেমন প্রসাদ নিয়ে আসা রীতি, পাঁউরুটি নিয়ে আসা প্রসাদের মতোই।

অসীমাদি জানালেন, আমাদের দুর্গোৎসবে যেমন ঘরে ঘরে মিষ্টি তৈরি করা হয়, খৃস্টান পরিবারেও কেক তৈরি শুরু হয়

মহিলাদের মধ্যে। 'স্টার' তৈরি খৃস্টান পরিবারে এক বিশেষ তাৎপর্যবহ। এটা একধরনের পিঠে। ডিম, ময়দা ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। স্টারের ছাঁচে ফেলে 'স্টার' তৈরি হয়।

খৃস্টান পরিবারগুলোতে বয়ে যায় আনন্দের রেশ। ধনী, মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্তদের ঘরে অভাব-অনটন ভুলে সকলেই সাধ্যমতো উৎসবে মেতে ওঠে। অসীমাদি শোনালেন এক বাজারওয়ালি কথা— যে তার অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে খুবই কষ্টে দিন কাটায়। বাজারে দুটো বাড়তি পয়সা রোজগারের জন্য নিজের বাড়িতে পোষা হাঁস-মুরগির দশ/বারোটা ডিম নিয়ে বাজারে বেচতে এসেছে, সঙ্গে চার বছরের ছোট ছেলে। উপরি পয়সা দিয়ে বাতি কিনে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা জানাবে। কেক তৈরি করবে সামান্য।

এমনকি উৎসবের পরেরদিন পাশাপাশি সকলে মিলে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবে। অসীমাদির পাড়ায় থাকেন রমাদি। তিনিও খৃস্টান। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় জানতে চাই, বড়দিন কেমন করে কাটাবেন? চটজলদি উত্তর : 'ভীষণ ভালভাবে কাটাবার ইচ্ছে।' শুধু কেক খাওয়া নয়, রাত্রি ১২টায় গির্জায় যাব সেখানে বাতি জ্বালাব আর প্রার্থনা জানাব। ঘরবাড়ি নানারঙিন কাগজ আর আলোয় সাজাব। আমার ছেলে-মেয়ে দুর্গাপুজোয় বন্ধুদের দেখে নতুন জামা পরতে চায়। ওদের আবদার বড়দিনে নতুন জামা পরবে। আমারও মত তাই। এখন কেনাকাটা করা বাকি। আর হ্যাঁ, সান্তাক্লজের জন্য চকলেট, গিফট কিনতে হবে।

সব মিলিয়ে অসীমাদির জোকার সত্যেনপার্ক সেজে উঠবে আলোয় আলোয়। ঘরে ঘরে ব্যস্ততা। এর মাঝে অসীমাদি দুর্গাপুজোর আনন্দের পর এদিনও ঘরোয়াভাবে নিজের গৃহকোণে যীশুর প্রতি প্রার্থনা জানিয়ে বাতি জ্বালিয়ে নীরব চোখে তাকিয়ে থাকবেন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

দীর্ঘ বিশ বছর পরেও সত্য আলো দেখলো না

অতিথি কলম

ডঃ সুব্রমানিয়াম স্বামী

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যা নগরে বাবরি মসজিদের যে ধাঁচা দাঁড়িয়েছিল তা ভেঙ্গে পড়ল। আজও সেদিনের ঘটনাটি জাতির সমক্ষে একটা ভয়াবহ দিনরূপে গণ্য, কারণ দেশের শিক্ষিত মানুষের কাছে সত্য উদঘাটিত হয়নি, তাই এই ঘটনা তাদের কাছে কিছু অপরাধীর কর্ম বলে মনে হয়েছে।

সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল? সেখানে এক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর যে মসজিদ গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত ওই নির্মাণের ঘটনাটি প্রকৃত অর্থে অপরাধীদের কাজ।

অযোধ্যার অস্থায়ী রামমন্দির।

দু' বছর আগে ঠিক একই মাস ও দিনে মথুরা রোডে আমার বাড়ির কাছে এক বাড়ীতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বিজেপির দুই সদস্যের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সবে শপথ নেওয়া প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে প্রয়াত চন্দ্রশেখর আমাকে বললেন (সেই সময়ে পদাধিকার বলে আমি ক্যাবিনেটে আইন মন্ত্রী ছিলাম) যে, আমি যেন ৯ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে দেশজুড়ে অযোধ্যা আন্দোলনের যে কর্মসূচী ছিল তা রদ করতে সচেষ্ট হই। তিনি আমাকে ভি এইচ পি নেতৃবর্গের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। চন্দ্রশেখরজী ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুসলিম নেতাদের সঙ্গে কথা বলে এক সমাধান সূত্র বের করবেন।

ভি এইচ পি এবং বিজেপি নেতৃবর্গ আমার অনুরোধে সাড়া দিয়ে আন্দোলন তুলে নিলেন। কারণ সেই সময়ে আমাদের সরকার ছিল নতুন। তাদের আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল যখন ভি পি সিংহ ক্ষমতাসীন। কিন্তু সেই সরকার নভেম্বরেই পড়ে যায়। এরপর চন্দ্রশেখর মুসলিম নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালান। দুর্ভাগ্যবশতঃ কথাবার্তা কিছুটা এগোলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি, কারণ সরকার বেশিদিন টেঁকেনি। যদি ইতিহাস অন্য পথে চলত তাহলে সম্ভবত মুসলিম নেতাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে একটা শান্তিপূর্ণ উপায় বের করে বাবরি মসজিদের স্থানে রামমন্দির গড়ে উঠত যদিও সরকার সংসদে সংখ্যালঘু।

তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে, ইচ্ছে থাকলে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আদৌ কোনও সমস্যা নয়। কেন্দ্রে আইনমন্ত্রী হবার সুবাদে আমি সেই বিতর্কিত বিচারক কে এম পাণ্ডেকে হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত করেছিলাম। কিন্তু ভি পি সিংহের তে-পায়া সরকার তাঁকে হাইকোর্টের বিচারক পদে উন্নীত করেনি। কেননা তিনি ১৯৮৬ সালে তথাকথিত রাম-মন্দিরের তালা খুলে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মুলায়ম তখন ইউপি-তে ক্ষমতাসীন। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়াতে মুলায়মও এ ব্যাপারে তেমন বিরোধিতা করেননি। মুলায়ম কৌশলগতভাবে আমাকে সমর্থন করেছেন, কারণ সেই সময়ে আমাকে ওঁর প্রয়োজন ছিল।

একই রকমভাবে চন্দ্রশেখর সরকারও কোনও ভয়ানক সন্ত্রাসবাদীকে মুক্তি না দিয়ে সইফুদ্দিন সোজের অপহৃত কন্যাকে ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিল, সেখানে কিন্তু সংসদের গরিষ্ঠতার দরকার হয়নি। আসলে মানসিকতার প্রয়োজন আর সেই মানসিকতার জোরেই সরকার অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের বিষয়ে প্রায় ঐকমত্য তৈরি করেই ফেলেছিল। যাই হোক, সমস্যা সমাধানের পূর্বেই সরকার পড়ে যায়।

কিন্তু কখনও কি মন্দির সম্পূর্ণ আইন মেনে ধ্বংস করা যেত? হিন্দুদের তথাকথিত সেকুলারবাদীদের কাছে নতজানু হওয়ার দরকার নেই কারণ সুপ্রীম কোর্ট ফারুকি বনাম ভারত সরকার [(১৯৯৪) এস সি সি ৩৬০] মামলায় স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছে যে, ইসলাম ধর্মে মসজিদের বিশেষ স্থান নেই, জনস্বার্থে এইসব মসজিদ ভাঙ্গা যেতে পারে এবং এরকম হয়ে যাচ্ছে। সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং এমনকী অবিভক্ত ভারতে বৃটিশরা রাস্তা বানাতে মসজিদ ভেঙেছে। নবী হজরত মহম্মদ যেখানে নামাজ পড়তেন সেই বিলাল মসজিদটি ভেঙে ফেলতে সৌদি সরকার দুবার ভাবেনি।

গীর্জার মতো মসজিদও কোনও ধর্মীয় স্থান নয় যেমনটা মন্দিরের বেলায়। মসজিদ, গীর্জা হলো এমন স্থান যেখানে মানুষ সমবেত হয় কেবল নামাজ পড়তে বা প্রার্থনা করতে। নামাজ তো যেখানে-সেখানে এমনকী রেল স্টেশনেও পড়া হয়। আমেরিকায় পরিত্যক্ত গীর্জা ভি এইচ

পি কিনে সেখানে মানুষকে ধর্মান্তরিত করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এবং এই বিষয়ে খৃস্টানরা প্রতিবাদ করেনি।

কিন্তু মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর নির্মিত মন্দিরে পূজা-পাঠ হয় এবং তা ঈশ্বরের আলয় বলে চিরকালের জন্য পূজিত হয়। কেন্দ্রের আইনমন্ত্রীর হবার সুবাদে ১৯৯১ সালে সরকারের আইন বিষয়ক দল নিয়ে বৃটেনের হাউস অব লর্ডসে প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, তাঞ্জাভুরের এক পরিত্যক্ত মন্দির থেকে নটরাজের মূর্তি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মন্দিরটি পরিত্যক্ত হলেও তা পূজার স্থান বলে এখনও মান্য করা হয়। এই বিষয়ে আমি রাজীব গান্ধীর পরামর্শ মতো চলেছি। অবশ্য বাস্তবে গণতন্ত্রে নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে গীর্জা বা মসজিদ ভাঙার অনুমতি দেয়নি।

অন্যদিকে সরকার আইনসম্মতভাবে অযোধ্যা, কাশী কিংবা বৃন্দাবনের মসজিদ সরিয়ে দিতে পারে। আমরা এ বিষয়ে মুসলিমদের সহযোগিতা কামনা করতে পারি— আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত।

বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছিল হিন্দুদের সঙ্গে শত্রুতা করেই। অন্যথা মসজিদটি অন্যত্র তৈরি হোত, কারণ নামাজ তো অন্য যে কোনও জায়গায় পড়া যায়। ৮০০ বছর মুসলিম রাজত্ব এবং ২০০ বছর বৃটিশ রাজত্বের পরও হিন্দুরা রয়েছে প্রাচীন সভ্যতার ধারক-বাহকরূপে। আজও আশি শতাংশ মানুষ হিন্দু। তাই এখন আমাদের পুরাতন ভুল সংশোধন করে নতুন করে দাবি জানাতে হবে। তাই তিনটি ধর্মীয় স্থান আযোধ্যা, মথুরা ও কাশী আমাদের পুনরুদ্ধার করতে হবে--- স্বদেশপ্রেমী রাজনৈতিক নেতারা এগিয়ে আসুন।

কিন্তু রাজনেতাদের অনুরোধ করা যত সহজ তার চেয়ে ঢের কঠিন এদের সংগঠিত করা। আমাদের এই দিশাহীন গণতন্ত্রে আমরা যেন ম্যাচ ফিক্সিং গেম খেলছি। তামিলনাড়ুতে ডি এম কে এবং এ আই ডি এম কে-র সম্পর্ক অহি-নকুলের। কিন্তু অধিকাংশ নির্বাচনী কেন্দ্রে কয়েক দশক ধরে টাকার খেলা চলছে। এ আই ডি এম কে-র শশীকলা আর ডি এম কে-র আর্কইভীয়াস্বামী— যাদের নেতাদের মধ্যে ইগো-র লড়াই চলে তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হিন্দু শক্তিকে ক্ষমতার বাইরে রাখতে যেন বদ্ধপরিকর।

একই রকমভাবে ম্যাচ-ফিক্সিং খেলা সারা দেশজুড়ে চলছে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রেও। আমাদেরকে এর থেকে মুক্ত করতে হবে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলি যেমন কলম্বিয়া, পেরুর মতো দেশগুলি গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে তার থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে হবে। এই ম্যাচ-ফিক্সিং রোগে সাংসদের বাইরে শিক্ষাবিদ এবং মিডিয়াও আক্রান্ত হিন্দু বিরোধী হিসেবে। বলা হয় এগুলো সব ব্যক্তিগত ব্যাপারে। যাই হোক, এগুলি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং সংগঠিত আঘাত। ঠিক যেমন হিটলার, মুসোলিনিকে দুনিয়া ব্যক্তিগত রূপে গণ্য করেন না, তাই আমাদের চিহ্নিত করতে হবে কারা হিন্দু-বিদ্বেষী। কিন্তু আমরা এর থেকে মুক্ত হতে পারি না। আমাদের মধ্যে আজও ''অর্জুন ভাইরাস''-এর মানসিকতা রয়েছে। স্বয়ং স্বামী চিন্ময়ানন্দ যিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের অনীহায় কথা উল্লেখ করে একথা বলেছিলেন। বাবরি মসজিদের পরম্পরার এই ভাইরাস আমাদের বহন করে বেড়াতে হচ্ছে বিশ বছর পরেও।

সূত্র : পাইওনীয়ার।

(লেখক : জনতা পার্টির সভাপতি)

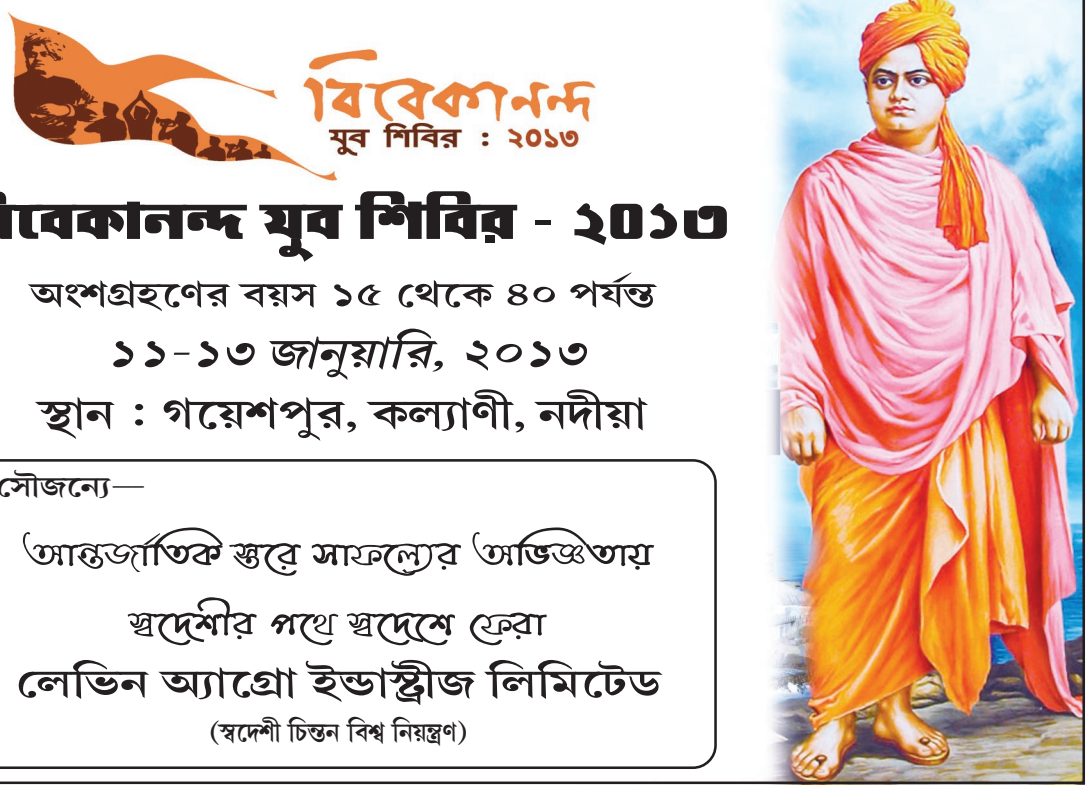

মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় শহীদদের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কথা ভাবেনি বাংলাদেশ

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উৎসবের মাস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। একাত্তরে দীর্ঘ ন' মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে পরাজিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ৯০ হাজারেরও বেশি সেনা ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে (তখন রেসকোর্স ময়দান) ভারতীয় মিত্র বাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ায়। সেই একাত্তর থেকে ডিসেম্বর বিজয়ের মাস। এই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের ৩০ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছেন, ধর্ষিতা হয়েছেন তিন থেকে চার লাখ নারী। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সহায়সম্বলহীন ১ কোটিরও বেশি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ১৭ থেকে ১৮ হাজার সেনা শহীদ হয়েছেন। ভারতের মানুষ সেদেশে আশ্রিত শরণার্থীদের মাথা গোঁজার ঠাঁই, খাবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, যার জন্যে তাদের বাড়তি কর দিতে হয়েছে পরবর্তী কয়েক বছর ধরে। নবজাত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সাহায্য দিয়েছে ভারত। খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়েছে। অন্য দেশকে স্বাধীন করার জন্যে এ ধরনের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। ধ্বংসস্তূপ থেকে ভারতের হাত ধরেই সেদিন উঠে দাঁড়িয়েছিল সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ। ভারতের চেষ্টায় পাকিস্তানি কারাগার থেকে ফিরে এসেছিলেন বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবর রহমান। তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সেনাও প্রত্যাহার করে নেয় ভারত। এত দ্রুত সেনা সরিয়ে নেওয়ার নজিরও বিশ্বে নেই।

মুজিবর রহমান

ধ্বংসস্তূপ থেকে ভারতের হাত ধরেই সেদিন উঠে দাঁড়িয়েছিল সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ। ভারতের চেষ্টায় পাকিস্তানি কারাগার থেকে ফিরে এসেছিলেন বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবর রহমান। তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সেনাও প্রত্যাহার করে নেয় ভারত। এত দ্রুত সেনা সরিয়ে নেওয়ার নজিরও বিশ্বে নেই।

কিন্তু সেই শহীদ ভারতীয় সেনাদের সম্মানে কোনও স্মৃতিসৌধ হয়নি বাংলাদেশে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত বৃটিশ সেনারা সসম্মানে সমাহিত আছেন বাংলাদেশের মাটিতে। মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে যে ভারতীয় সেনারা আত্মদান করেছিলেন বিজয়ের মাসে তাঁরা উৎসবের উল্লেখযোগ্য কোনও অংশ হন না। অন্তত তিন দশক ধরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান সংগঠন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ ও মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশন শহীদ ভারতীয় মিত্রসেনাদের সম্মানে স্মৃতিসৌধ

নির্মাণ, প্রয়াত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ফিল্ড মার্শাল শ্যাম মানেকশ ও লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সম্মানে রাজধানীতে তিনটি প্রধান সড়কের নামকরণের দাবি জানালেও এখনও সরকারিভাবে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পর সাড়ে তিন বছর এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী শক্তি আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় ছিল, তৃতীয় দফায় ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ক্ষমতায় রয়েছে। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের মিত্র হিসেবে গত বছর এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ইন্দিরা গান্ধী বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেছেন কংগ্রেস চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী। অন্য দুই সমরনায়কও মরণোত্তর সম্মাননা পেয়েছেন অন্য মিত্রদের সঙ্গে। সম্মাননা পেয়েছেন আরও কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা। কিন্তু শহীদদের সম্মানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কথা কেউ ভাবেননি। কর্তাব্যক্তিদের কেউ ভাবেন না কোনও সড়কের নামকরণের কথা। অথচ কলকাতায় অন্তত দেড় দশক আগে শেখ মুজিবর রহমানের নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের নামকরণ হয়ে গেছে। শেখ মুজিব ছাত্রাবস্থায় বেকার হোস্টেলের যে কক্ষে থাকতেন সেটিও জাদুঘরে রূপ পাচ্ছে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মুনতাসির মামুনের এক রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত সোহরাওয়াদি উদ্যানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল সইয়ের স্থান (যেখানে একটি টেবিলে বসে পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজি মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে সই করেছিলেন) শেখ মুজিবর রহমান একাত্তরের ৭ মার্চ যে স্থান থেকে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন এবং বাহাত্তরে মার্চ মাসে ইন্দিরা গান্ধী ঢাকা সফরে এসে এই উদ্যানে জনসভায় যে নৌকাকৃতি মঞ্চ থেকে সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই স্থানগুলো যথাযথ মর্যাদায় সংরক্ষণের নির্দেশ দিলেও আজও তা পালিত হয়নি। ইন্দিরার জনসভার মঞ্চটি ভেঙে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে শিশুপার্ক করেছিলেন, হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও স্থানটি আজও উদ্ধার হয়নি।

মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে ২০০৬ সালের ৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়াদি উদ্যানে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির ফলক স্থাপন করে ভারতের শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। তখন থেকে বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি পরিষদের সহায়তায় এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়ে আসছে প্রতি বছর। একাত্তরের ৬ ডিসেম্বর ভারত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই ঐতিহাসিক দিনে ভারতের শহীদ জওয়ানদের স্মরণ করে ফুল দিতে আসেন কেউ কেউ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় বড় বক্তৃতা করলেও বড় মাপের রাজনৈতিক কোনও নেতা কিংবা মন্ত্রী পা বাড়ান না। ঢাকা মহানগর আওয়ামি লিগের দু একজন নেতাকর্মী এসে ফুল দিয়ে যান। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ৬ ডিসেম্বর ভারতের স্বীকৃতির কথা স্মরণ করে আলোচনা সভার আয়োজন করে। সেখানে কোনও কোনও মন্ত্রী থাকেন। এবার ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপুমণি। সভায় ভারতীয় হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণ উপস্থিত ছিলেন। কোনও কোনও বক্তা অবশ্য শহীদ ভারতীয় জওয়ানদের কথা স্মরণ করেছেন।

নেত্রদান মহাদান

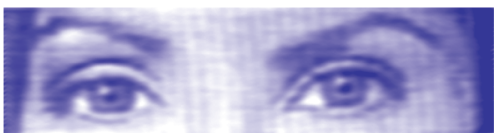

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

লিখুঁত লেখার খাতা

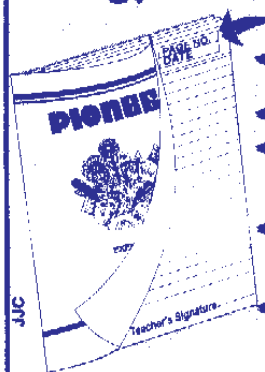

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane(1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবনে সংস্কৃত ভারতী

দীনেশ কামত

দক্ষিণবঙ্গের হালিশহরে সংস্কৃতভারতীর সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গ।

বিশ্বের প্রাচীনতম, সমৃদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডারযুক্ত পৃথিবীর বহু ভাষার মাতৃস্থানে বিরাজিত, কালবিজয়ী ভাষা— সংস্কৃত ভাষার স্থান অতি বিশিষ্ট ও মহত্ত্বপূর্ণ। সংস্কৃত ভাষা কেবলমাত্র একটা ভাষা নয়, তা হলো এক বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরম্পরা, যা হলো— এক জীবন দর্শন।

ভারতের জ্ঞান সংস্কৃতির ও সভ্যতার বাহক এই সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ছাড়া ভারতের ভারতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সংস্কৃত ভারতের প্রাণ স্পন্দন— সংস্কৃত ছাড়া ভারত ভারতই হতে পারে না। ভারতের পুনর্নির্মাণের জন্য সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবন অনিবার্য— যা শ্রী অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, দয়ানন্দ সরস্বতী, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ মহাপুরুষরা চিন্তা করেছিলেন।

ভারতীয় ভাষাগুলির অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের জন্য সংস্কৃত আবশ্যক। উচ্চ নীচ ভেদভাব নিবারণ তথা সামাজিক সহমর্মিতা ও রাষ্ট্রীয় একতার জন্য ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা 'সংস্কৃত ভাষা'ই হোক— ড. বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর ভারতের সংবিধান রচনার সময় প্রস্তাব প্রকাশ করেছিলেন। সংস্কৃতের উন্নয়ন দ্বারাই ভারতের উন্নয়ন সম্ভব। সংস্কৃতের উন্নয়ন দ্বারাই ভারত জগৎগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে— এটাই মহাপুরুষগণের পথনির্দেশ।

ভাষা পুনরুজ্জীবনে সংস্কৃত ভারতী

 ভাষা পুনরুজ্জীবনে প্রথম সোপান হলো সম্ভাষণ (কথাবার্তা) যার ভাবনা সংস্কৃত ভারতী করে থাকে।

 দশদিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির দেশে আজ পর্যন্ত ১ লক্ষ কুড়ি হাজারেরও অধিক স্থানে হয়েছে এবং এইসব শিবিরে ৮০ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

 পরিণামে স্বরূপ সংস্কৃত অত্যন্ত সরল— এই ভাব সমাজে জাগরিত হয়েছে। এই কারণে সংস্কৃত জগতের বাইরের ব্যক্তিরাও অধিকাধিক পরিমাণে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছেন।

 দিল্লীতে গত দশ বছর নিরন্তর চলমান সংস্কৃত পাঠ কেন্দ্র--- 'সংবাদশালা'--- যেখানে আজ পর্যন্ত প্রায় ৭০০০ জন অংশগ্রহণ করে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার সামর্থ্য লাভ করেছেন।

 সহজ পাঠ্য, সহজ পাঠ্যক্রম— এই ভাবনার ভিত্তিতে বালকদের জন্য 'সরল সংস্কৃত পরীক্ষা' চালু করেছে। গত বছর ১৩টি রাজ্যে লক্ষাধিক ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছে। এবছর ২১টি রাজ্যের প্রায় ৩ লক্ষাধিক ছাত্রের নাম নথিভুক্ত করেছে।

 বালকদের প্রাথমিক সংস্কারের জন্য 'সংস্কৃত-বালকেন্দ্রম্' চলছে।

 'সান্ধ্যপাঠ কেন্দ্রম্' সাপ্তাহিক কক্ষ (Weekend Class) ইত্যাদি ব্যবস্থা করেছে।

 'গীতা শিক্ষণ কেন্দ্রম'— সংস্কৃত-এর মাধ্যমে ভগবদ্‌গীতা পাঠের এক বিশিষ্ট পাঠ্যক্রম।

 'পত্রের মাধ্যমে সংস্কৃতম্' ভারতের ৮টি ভাষায় চলছে যা বাড়ীতে বসেই সংস্কৃত শেখার এক অভিনব পদ্ধতি। হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, তেলুগু, মালায়ালম, কন্নড়, ইংরাজী ইত্যাদি। আজ পর্যন্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার জন ছাত্ররূপে পাঠগ্রহণ করেছেন। এখন হাজার হাজার ছাত্র এই যোজনায় পড়াশোনা করছেন।

 যাঁরা সংস্কৃত পড়তে পারেন তাঁদের রুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের সরল সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ৫০০ প্রকারেরও অধিক গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ব্যাকরণ পুস্তক ছাড়াও পঞ্চাশ প্রকারের অধিক অডিও, ভিডিও, সিডি প্রকাশিত হয়েছে।

 'সম্ভাষণ-সন্দেশ' মাসিক পত্রিকা ১৪টি দেশে প্রায় এক লক্ষেরও অধিক গ্রাহক প্রতি মাসে সংস্কৃত মাধ্যমে পড়ছেন।

 আধুনিক প্রযুক্তির (তন্ত্রজ্ঞান) ব্যবহার করে সংস্কৃত উইকিপিডিয়া (Samskrit Wikipedia) চালু করা হয়েছে। যেখানে গত দু' বছরের মধ্যে ৮,০০০ (আট হাজার) প্রবন্ধ যুক্ত হয়েছে।

 নূতন সংস্কৃত সাহিত্য লেখকদের নির্মাণের জন্য 'লেখা-অনুবাদ' কার্যশালা দেশের প্রায় সমস্ত রাজ্যে চালু করা হয়েছে।

 'সরস্বতী সেবা' যোজনা অনুসারে

দেশের বিভিন্ন ভাষার জনপ্রিয় পুস্তকগুলি সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

□ প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি রাজ্যে ব্যাপকরূপে ভাষা বোধনবর্গ, শিক্ষক-প্রশিক্ষণবর্গ, শিবির চালক প্রশিক্ষণ বর্গ, নৈপুণ্যবর্গ ইত্যাদি চলছে। অখিল ভারতীয় স্তরে ব্যাকরণ বর্গ, কাব্যস্বাদন বর্গ ইত্যাদি আয়োজন করা হচ্ছে।

□ শাস্ত্রগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য 'শলীকা পরীক্ষা', 'ভাষাব্যুৎপত্তি যোজনা' ইত্যাদি বিবিধ-ব্যবস্থা করে চলেছে।

□ বর্তমানে পাঁচ হাজারের অধিক সংস্কৃত পরিবার যাদের ব্যবহারিক ভাষা তথা মাতৃভাষা সংস্কৃত। সংস্কৃত ভারতীর প্রয়াসে এটা সম্ভব হয়েছে।

প্রশিক্ষণবর্গে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী।

□ সংস্কৃত গ্রামও নির্মাণ হোক এই উদ্যোগে কর্ণাটকের মুত্তুর, মধ্যপ্রদেশের ঝিরি, উত্তরাখণ্ডের ধন্তোলা ইত্যাদি স্থানে সর্বতোভাবে প্রয়াস চলছে।

□ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত পড়ানোর উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সংস্কৃত শিক্ষকদের কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।

□ সংস্কৃত অনুরাগী বিভিন্ন সংস্থা, সংস্কৃতানুরাগী সামাজিক ব্যক্তিবর্গ সকলে মিলে সংস্কৃতের জন্য কাজ করুন— এই উদ্দেশ্যে প্রয়াস চলছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত অ্যাকাডেমি, প্রাচ্যবিদ্যা সংস্থান ইত্যাদি মিলিত হয়ে ২০১০-এ বর্ষে বিশ্বসংস্কৃত মেলা আয়োজন করেছে— যা এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ২০১৩ বর্ষে সংস্কৃত সাহিত্যোৎসব উজ্জয়িনীতে আয়োজিত হতে চলেছে।

□ জনজাগরণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে স্থানে স্থানে শোভাযাত্রা, শিবিরাভিযানম্, সংস্কৃতোদিনোৎসব, সংস্কৃত সপ্তাহ, সংস্কৃত সম্পদ, সংস্কৃত সম্মেলন, সংস্কৃতোৎসব ইত্যাদি কার্যক্রমের আয়োজন করে চলেছে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, দুবাই, আবুধাবি, কাতার ইত্যাদি স্থানে নিয়মিত রূপে সংস্কৃত পঠন কেন্দ্র চলছে। সংস্কৃত শিক্ষণের জন্য বিবিধ প্রকারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে চলেছে 'সংস্কৃত ভারতী।'

(লেখক অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক, সংস্কৃত ভারতী)

স্বস্তিকা

স্বামীজীর সার্ধজন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ৭ জানুয়ারি, ২০১৩

ভারতবর্ষ এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। স্বামীজী বলেছিলেন, 'ওঠ! জাগ! লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত এগিয়ে চল।' পরাধীন জাতির নিদ্রা ভাঙ্গাতে তাঁর লক্ষ্য ছিল যুবকরা। দেশের সেই সুপ্ত অবস্থা আজও কাটেনি। 'তাই বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষের পুণ্যলগ্নে একদিকে যখন ভারতাত্মার জয়গানে মুখরিত হচ্ছে বিশ্ববাসী, অন্যদিকে তখন দেশ ডুবে যাচ্ছে দুর্নীতি আর মিথ্যাচারের পঙ্কে। স্বামীজী'র জীবন ও বাণী কি তবে বিফলে যাবে? কিন্তু তা তো হবার নয়। দেশের নাম যে ভারতবর্ষ। তাকে তো ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। স্বামীজীর জন্মের দেড়শো বছরে স্বস্তিকার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। লিখছেন : অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়, ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ, ড. অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যনারায়ণ রাও, গোপালকৃষ্ণ রায়, রমাপ্রসাদ দত্ত ও আরও অনেকে।

দাম একই থাকছে— সাত টাকা

‘টাট্টুঘোড়া রিটার্ন’

‘পোলো টুর্নামেন্ট’ মণিপুরে

বিরাজ রায়॥ বারো বছর বাদে ইম্ফলে অনুষ্ঠিত হলো ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক পোলো টুর্নামেন্ট। তাতে ভারতের দুটি টিম ছাড়াও অংশ নিয়েছে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও থাইল্যান্ডের কয়েকটি টিম। তবে বিনোদন বা বাণিজ্য নয়, মণিপুরের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতেই এই টুর্নামেন্ট। মণিপুরের সংস্কৃতির একটি অঙ্গই হলো পোলো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই খেলা চালু থাকলেও মণিপুরে তা কয়েকবছর ধরে বন্ধ ছিল। কলকাতার মানুষ যখন ক্রিকেট দেখতে ইডেনে ভীড় জমাচ্ছে, ইম্ফল তখন দেখতে উৎসাহী টাট্টু ঘোড়া রিটার্ন।

১৯৯১ সালে মণিপুরে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় পোলো টুর্নামেন্ট, ১৮৯১ সালের ইংরেজ ও মণিপুর রাজ্যের যুদ্ধকে স্মরণে রাখতে এই টুর্নামেন্ট চালু হয়। তারপর থেকে প্রতি দু-বছর অন্তর এটি হয়ে আসছে। শুরুটা কিন্তু এখান থেকেই নয়, ইতিহাসটা আরও পুরানো। উনিশ শতকে বা তারও আগে মণিপুরে অভিজাত শ্রেণীতে বহুল প্রচলিত ছিল এই খেলা। অসমের রাজা গম্ভীর সিং ও নরসিংও অংশ নিয়েছেন পোলো টুর্নামেন্টে। ৪৪-৫২ ইঞ্চি লম্বা টাট্টু ঘোড়া নিয়ে তারা যখন মাঠে নামতেন ইংরেজরা তা বিস্ময়ের চোখে দেখত। পরবর্তীকালে সপ্তবর্ষব্যাপী বার্মার যুদ্ধে অসমের রাজপাট উঠে যায়। তারপর অসমের সাধারণ মানুষের কাছেও মলিন হতে থাকে টাট্টু ঘোড়ার স্মৃতি। ১৮৫৯ সালে ইংরেজরা প্রথম স্থাপন করে পোলো ক্লাব। তার দশ বছর পরে হয় কলকাতায়। সেই সময় মণিপুরি এই ঘোড়া পোষা ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। কিন্তু এখন সেই টাট্টু ঘোড়া ইম্ফলে নেড়ি কুকুরের মতো একটি পরিত্যক্ত প্রাণী। অনেকে মনে করেন পর্যাপ্ত পরিমাণ চারণভূমি না থাকার জন্যই এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। মাঠ না থাকার জন্য ইম্ফলের পরিবারগুলিও আর ঘোড়া রাখছে না। আগে যে মাঠগুলি ঘোড়ার জন্য ব্যবহার হোত, সেগুলিতে এখন চাষবাস করা হচ্ছে। মণিপুর পোলো অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ডাঃ কশ চৌরজিৎ (Dr. Ksh Chourjit) জানিয়েছেন— ‘এক সময়ে মণিপুরের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে কম করে দুটি করে ঘোড়া থাকতো। ভাবতে অবাক লাগছে এখন এখানে ঘোড়ার সংখ্যা এক হাজারেরও কম।’ তবে এতো সবের মধ্যেও কিন্তু ‘পোলো’ আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ‘মণিপুর হর্স রাইডিং এন্ড পোলো অ্যাসোসিয়েশন’। ২০০৫ সালে এটি শুরু হয়েছিল ৭০টি ঘোড়া নিয়ে। এখন তা দাঁড়িয়েছে ১৩০। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম আকর্ষিত হচ্ছে ‘পোলো’-র প্রতি। রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ীরাও আগ্রহী এই খেলায়। গত পাঁচ বছরে মণিপুরের পোলো টিম অনেক চাঙ্গা হয়েছে বলে মনে করছেন টিমের ক্যাপ্টেন খাবা (Khaba)। মণিপুরে তাদের চোদ্দটি পোলো ক্লাব আছে। তারমধ্যে পাঁচটি খুব ভাল, সেখানে তিরিশটি করে ঘোড়া আছে। অনেকে স্থানীয় ভাবেই উদ্যোগী হচ্ছে পোলো টুর্নামেন্ট করতে। পোলোর সঙ্গে তারা সংরক্ষণ করতে আগ্রহী টাট্টু ঘোড়াকেও।

মণিপুরের প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরে আসছে; কিন্তু পরিবর্তন তো কিছু একটা হয়েছেই...! আগে ‘পোলো’কে ধনীদের খেলা বলেই মনে করা করা হোত, এখন এই বিভেদটা ঘুছে গেছে। অনেক সাধারণ ঘরের ছেলেরাও যোগ দিতে আসছে ‘পোলো ক্লাবে’।

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

ভারতবাসীরা যোদ্ধা—যুগে যুগে বিদেশীদের প্রতিহত করেছে

পুস্তক প্রসঙ্গ

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

অমলেশ মিশ্র প্রণীত 'ভারতবর্ষ বনাম ইন্ডিয়া' লেখকের ভাষায় 'প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে' লিখিত ১১টি প্রবন্ধ সংকলন। গ্রন্থের শুরুতে লেখকের এই ঘোষণা প্রত্যেকটি প্রবন্ধে সুপ্রকাশিত।

প্রথম প্রবন্ধ— 'ভারতবর্ষ বনাম ইন্ডিয়া' নামে যেমন, বিষয়েও তেমনি বিস্ফোরক। ১৪ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধে লেখক শ্রী মিশ্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের প্রচলিত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ম্যাক্সমুলারের বেদচর্চার উদ্দেশ্য ছিল খৃস্টধর্মকে হিন্দুধর্মের উপর স্থাপন করা এবং এই উদ্দেশ্য তৎকালীন সেক্রেটারি অফ স্টেটস ফর ইন্ডিয়া ডিউক অফ আরগিলকে লিখে জানিয়েছিলেন, (পৃ. ১১) আমরা হিন্দুরা সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলি। লেখকের ভাষায় হিন্দুশাস্ত্রে কখনও একথা বলা হয়নি। এই ধরনের প্রচার হিন্দুদের আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিলুপ্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে।

'যোদ্ধা ভারতবাসী' গ্রন্থটির দীর্ঘ প্রবন্ধ। লেখক এই প্রবন্ধেও 'প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে' বক্তব্য রেখেছেন। ভারতবাসীরা আধ্যাত্মিকতাবাদী--- এই ধরনের বক্তব্য ভারতবর্ষকে দুর্বল করেছে। ভারতবাসীরা লড়াকু--- তারা যোদ্ধা। তারা যুগে যুগে বিদেশীদের যুদ্ধ করে প্রতিহত করেছে। লক্ষণীয় মুসলিম যোদ্ধারা পৃথিবীর অন্যদেশে যেখানে গেছে সে দেশটিকে পুরোপুরি ইসলামে দীক্ষিত করেছে। কিন্তু এক হাজার বছর দাপিয়ে রাজত্ব করেও তারা ভারতে সামান্যমাত্র ধর্মীয় প্রভাব ফেলতে পারেনি। ভারতবাসীরা যোদ্ধার জাতি না হলে কি এমনটা হোত?

'সব ধর্ম এক নয়! গোলাকার বর্গক্ষেত্র হয় না'— আরেকটি বিস্ফোরক প্রবন্ধ। আমরা আজকাল কিছু কিছু হিন্দু ধর্ম প্রচারকের প্রচারে শিখেছি যে সব ধর্ম সমান। অথচ হিন্দুধর্মের পক্ষে এর চেয়ে ক্ষতিকর বক্তব্য কিছু হতে পারে না। হিন্দুধর্ম তার শিক্ষায়, দীক্ষায়, আচারে, আচরণে, বিশিষ্টতায়, মূল্যবোধে অন্য সব ধর্মের চেয়ে আলাদা। লেখক স্পষ্টই বলেছেন : ''সব ধর্মই সমান এই তত্ত্ব আউড়ে হিন্দুধর্ম বেঁচে থাকার প্রয়োজনটাই প্রশ্নের মুখে পড়ে। হিন্দু ধর্মের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়।'' (পৃ. ৯৮)

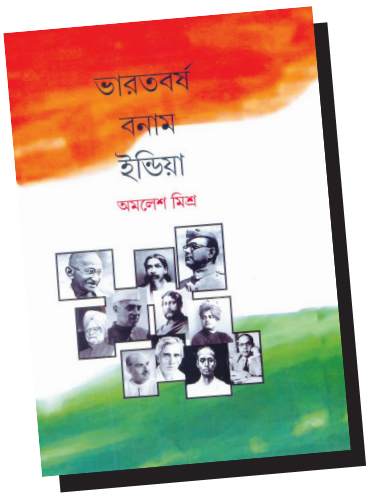

'ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কি একটি মিশ্র সংস্কৃতি— আরেকটি প্রবন্ধ। লেখকের আশঙ্কা যেভাবে সরকার ও বিভিন্ন দল হিন্দুদের নানা

প্রক্রিয়ায় কোণঠাসা করছে তাতে ভারতে একদিন হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বীজ বপন করেছিলেন।

'রামমন্দির ইতিহাস ও মামলা' এই গ্রন্থের আরেকটি উজ্জ্বল প্রবন্ধ। দীর্ঘ ২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে লেখক বহু সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে জানিয়েছেন বহু প্রাচীন রামমন্দির ১৫২৮ সালে বাবরি মসজিদে পরিণত করা হয়েছিল। তাঁর আলোচনায় উঠে এসেছে বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুদের সেই ষোড়শ শতাব্দী থেকে অবিরত আন্দোলন— যা আমাদের জাগায় স্বাভিমানবোধ এবং ভুয়ো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরূপতা।

'টেরেসার নামে মুদ্রা পীড়াদায়ক সিদ্ধান্ত'— এই গ্রন্থের আরেকটি বিস্ফোরক প্রবন্ধ। যে 'মা' টেরেসা দরিদ্র মানুষদের সেবার জন্য 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজ' নির্মাণ করেছিলেন, সেবার স্বীকৃতির জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন লেখকের তীক্ষ্ণ কলমে ফুটে উঠেছে সেই 'মাদার'-এর আসল চরিত্র— তাঁর শঠতা, অর্থ তছরূপ, তাঁর সংস্থার নামে মিথ্যা প্রচার ও মিথ্যা প্রচার করে অর্থ উপার্জন, অসহায় শিশুদের পরিচর্যার নামে নির্যাতন, শিশু ও আতুরদের অখ্যাদ্য কুখাদ্য পরিবেশন ইত্যাদি আরও কত ব্যভিচার। লেখক শ্রী মিশ্র দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষ-বন্যা পীড়িতদের সেবার কাজে যেখানে সব রাজ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও রামকৃষ্ণ মিশন উপস্থিত সেখানে মিশনারিটিজ অফ চ্যারিটিজ-এর উপস্থিতি নেই। অথচ কলকাতাকে দরিদ্র ও নোংরা শহর হিসেবে বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত করিয়ে যে টাকা সংগ্রহ করেছেন তা এতটুকু কলকাতার মানুষের জন্য ব্যয় করেননি।

এই গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'A Note Sheet : On Education for 21st Century'— বলিষ্ঠ বক্তব্যে উজ্জ্বল। তাঁর মূল কথা ২১ শতকের শিক্ষানীতির লক্ষ্য হবে বাহ্যিক প্রগতি নয় ভিতরের মানুষের পরিবর্তন সাধন।

মোট কথা অমলেশ মিশ্র মহাশয়ের 'ভারতবর্ষ বনাম ইন্ডিয়া' অতি মূল্যবান এবং দেশের চিন্তা জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। পুরনো চিন্তাধারার মূলে আঘাত করার লক্ষ্যে এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা অতি প্রশংসনীয়। এবং মূল্যও সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে।

ভারতবর্ষ বনাম ইন্ডিয়া। অমলেশ মিশ্র
পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০০।
মূল্য ২০০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

জামতলায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পথসঞ্চলন

স্বামীজির সার্ধশতবার্ষিকী জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সারা পশ্চিমবাংলার প্রতি জেলা, মহকুমা ও খণ্ডে পথসঞ্চলন আয়োজন করেছিল। সেই সূত্রে অনেকদিন ধরেই সুন্দরবন জেলার জামতলায় পথসঞ্চলনকে কেন্দ্র করে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল গত ১৮ নভেম্বর। দুটো জায়গা থেকে পথসঞ্চলন শুরু হয় একই সঙ্গে এবং জামতলা উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে মিলিত হয়। একটা পথসঞ্চলন শুরু হয় জালবেড়িয়া আশ্রমের মাঠ থেকে এবং অন্যটা শুরু হয় দীঘির পাড় থেকে। এই দুই পথ সঞ্চালনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। সর্বমোট ৮০০ জন স্বয়ংসেবক পূর্ণ গণবেশে এই পথ সঞ্চালনে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতির মা-বোনেদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। জামতলা হাইস্কুলের মাঠে স্বয়ংসেবক, সঙ্ঘ শুভানুধ্যায়ী ও সুধী নাগরিকদের সামনে বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে চীনের আগ্রাসী মনোভাব, ভারতে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রাজনৈতিক নেতাদের ভ্রষ্টাচার ও দেশবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে স্বয়ংসেবকদের অবহিত করেন এবং সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেন। কল্যাণীতে আসন্ন যুবশিবির উপলক্ষে বেশি বেশি সংখ্যায় যুবকদের অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।

এছাড়াও এই মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সুন্দরবন জেলার সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালী এবং বারুইপুর নগর সঙ্ঘচালক ডঃ ইন্দ্রজিৎ সরকার।

পথ সঞ্চলন জামতলা মোড়ে পৌঁছানোর পর মা-বোনেদের মুহুর্মুহু পুষ্পবৃষ্টি, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি পরিবেশের ভাব গাম্ভীর্য বাড়িয়ে দেয়। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য যথাযথ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

আধ্যাত্মিক চেতনা জাগাতে 'অগ্নিবীর'

বর্তমানে ভারত তথা বাংলায় একটা অশান্তি বিরাজ করছে। বিশেষত বাংলায় যে অস্থিরতা— তা ভাবলে আজও ভয়ঙ্কর মনে হয়। এই বাংলার মাটিতেই মনীষীদের, মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাঁরা সকলেই শান্তির বাণী ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু সেইসব বাণী আজকের দিনে কেউ অনুসরণ করে না। এইরকম এক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে 'অগ্নিবীর' সংস্থা এক নতুন আলোর সন্ধান দিতে প্রয়াস চালাচ্ছে। তাদের কর্মপদ্ধতি উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে প্রসার ও প্রচার করতে গত ১৮ নভেম্বর, রবিবার কলকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলে 'ক্যালকাটা লজ'-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ওইদিনই সন্ধ্যা ছ'টায় ময়রা স্ট্রিটের 'বিদ্যামন্দির'-এ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার পক্ষ থেকে সঞ্জীব কুমার সংস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান, 'অগ্নিবীর' শব্দটি যজুর্বেদের শ্লোক থেকে গৃহীত, যার অর্থ 'পরম শক্তি' অর্থাৎ 'সুপ্রিম পাওয়ার'। তাকে ভিত্তি করে দুটি লক্ষ্য বা মটো নিয়ে এগিয়ে চলা 'অগ্নিবীর' সংস্থার কাজ। প্রথমত, সকল জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে আধ্যাত্মিক চেতনায় কাজ করা এবং দ্বিতীয়ত, নারীশক্তির মর্যাদাদান। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ও সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্ট ও লিভিং ফাউন্ডেশন-এর বিশ্বজনীন ডিরেক্টর স্বামী মহেশ গিরি মহারাজ। তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রথমেই পশ্চিমবাংলা শুধু নয়, সামগ্রিক বাংলাকে পুণ্যভূমি বলে সম্বোধন করলেন। পশ্চিমবাংলার বুকেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, আরও অনেক পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ বাংলাতেই জন্মেছেন। বাংলার মাটিকে ধন্য করেছেন। কিন্তু আজ সেখানেই শান্তির অভাব। উনি বলেন, এটা একমাত্র ঘটছে আধ্যাত্মিক চেতনার অভাবে। অধ্যাত্ম হলো শান্তির ভিত্তি। এই বাংলার ভূমিতেই 'অগ্নিবীর'-এর উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

সন্ধ্যার অনুষ্ঠান স্তোত্রের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। মহেশগিরিজীর ভাষণের পর সৎসঙ্গের পক্ষে ভজন পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় সংস্থার সভাপতি ডাঃ সমীর চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ সৌরভ ঝুনঝুনওয়ালা এবং সঞ্জীব কুমারের অবদান অনস্বীকার্য।

চাঁচলে "বিবেকানন্দ ভবন"

গত ৮ ডিসেম্বর শুভ মুহূর্তে মালদা জেলার চাঁচলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলা কার্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন হোম-যজ্ঞ সহ এক আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। নারকেল ভেঙে 'গৃহপ্রবেশ' করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী ঋতপানন্দ মহারাজ। তাঁকে অনুগমন করেন সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী সমিতির সদস্য শ্রীকৃষ্ণরাও মোতলগ, সুনীলপদ গোস্বামী, ক্ষেত্রকার্যবাহ সত্যনারায়ণ মুজমদার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার, জেলা কার্যবাহ দেবব্রত দাস, জেলা প্রচারক মথুরা হেঁস এবং অন্যান্য কার্যকর্তা এবং স্থানীয় স্বয়ংসেবক ও অধিবাসীবৃন্দ। কার্যালয় প্রাঙ্গণে গৃহপ্রবেশের আগে এক সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার এবং স্বামী ঋতপানন্দজী। কার্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে 'বিবেকানন্দ ভবন'। শ্রী দত্ত বলেন, সীমান্ত জেলা মালদায় সঙ্ঘকাজ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই চাঁচলে সাংগঠনিক জেলা-ব্যবস্থা। আমাদের স্বজাতি, স্বধর্ম এবং স্বকীয়তা রক্ষার জন্যই এই কার্যালয়ের আবশ্যকতা রয়েছে। স্বামী ঋতপানন্দজী বলেন, এই এলাকায় হিন্দুত্বের প্রচার-প্রসার, সেবাকাজ এবং সাংগঠনিক কাজের বৃদ্ধিতে কার্যালয়টি ব্যবহৃত হবে, এটাই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত, সেবাভারতী উত্তর মালদা ট্রাস্ট এবং স্থানীয় স্বয়ংসেবক ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় এই কার্যালয় নির্মিত হয়েছে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রবীণ কার্যকর্তা সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান জেলা কার্যবাহ দেবব্রত দাস। সভার শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অদিতি দাসগুপ্ত, আলোলিকা রায় ও তিতিক্ষা দাস। এদিন সানন্দে ছয় শতাধিক চাঁচলবাসী খিচুড়ি গ্রহণ করেন।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া বিভাগ সঙ্ঘচালক দুর্গাদাস রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠপুত্র সুরজিৎ-এর সঙ্গে মৃন্ময় কুমার সাহার কনিষ্ঠা কন্যা মুনমুনের শুভবিবাহ সুস্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে নবদম্পতি মঙ্গলনিধি ১১০০০ (এগার হাজার টাকা) দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহব্যবস্থা প্রমুখ কল্যাণ সাহার হাতে সমর্পণ করে। কেন্দ্রীয় অধিকারী মাননীয় সুনীলপদ গোস্বামী ও প্রান্ত অধিকারী শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে নতুন বস্ত্র দিয়ে বরণ করা হয়।

শোকসংবাদ

গত ২৭ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোচবিহার নিবাসী অসিত সরকার পরলোকগমন করেছেন। ছোট থেকেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ছিলেন। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের ধর্মজাগরণ সমন্বয় সমিতির প্রমুখ ছিলেন। কোচবিহার শিশু মন্দিরের জন্মলগ্ন থেকেই সম্পাদক ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কবি দপ্তরের আয়কর বিভাগের চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। সাহিত্য নিয়েও চর্চা করতেন। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান।

***

গত ২৯ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া নগরের বৈকুণ্ঠপুর শাখার স্বয়ংসেবক দেবীপ্রসাদ বসুর মাতৃদেবী ভবানীরাণী বসু ৮২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। অনেক স্বয়ংসেবক তাঁর কাছে সঙ্ঘকাজের প্রেরণা পেয়েছেন।

***

গত ৩ ডিসেম্বর উলুবেড়িয়া মহকুমার কালিনগর জগদীশপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক কমল দত্ত পরলোকে যাত্রা করেছেন। তিনি সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ শিক্ষিত ছিলেন। তাঁতিবেড়িয়া সঙ্ঘশিক্ষা বর্গে ব্যাবস্থা বিভাগের দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন সম্পাদক ও বর্তমানে হাওড়া গ্রামীণ জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির সহ-সভাপতি ছিলেন।

***

গত ৪ ডিসেম্বর ডোমজুর মহকুমার পাঁচলা খণ্ডের সাহাপুর শাখার মুখ্যশিক্ষক সুরজিত সরদার ১৭ বছর বয়সে ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে অকাল দেহত্যাগ করেছে। সে একাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের ছাত্র ছিল। সুরজিতের অকাল মৃত্যুতে সবাই গভীর শোকাহত।

প্রকাশিত হবে
২৮ জানুয়ারি
২০১৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৮ জানুয়ারি
২০১৩

বিবেকানন্দ যুব শিবির সংখ্যা

২০১৩ সালের ১১, ১২, ও ১৩ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশত উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে নদীয়ার কল্যাণী শহরের উপকণ্ঠে গয়েশপুরে অনুষ্ঠিতব্য বিবেকানন্দ যুব শিবির আক্ষরিক অর্থেই বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন। সমাজে এর প্রভাব কতটা সুদুরপ্রসারী হতে পারে তাই-ই আমাদের আলোচ্য। রঙিন চিত্র সম্বলিত অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এই সংখ্যাটি শুধুমাত্র যুব শিবিরে যোগদানকারীদেরই নয়, প্রতিটি বিবেকানন্দ-অনুরাগী মানুষের জন্যও সংরক্ষণযোগ্য।

।। তারিখের মধ্যে কপি বুক করুন।। মূল্য ১০ টাকা।।

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY
RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH
SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155
CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

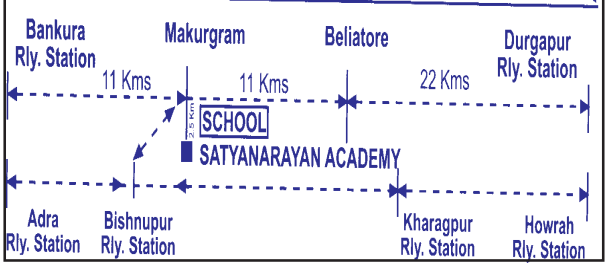

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ঠিকানা ভারতবর্ষ

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

সম্প্রতি কলকাতায় রাজা রামমোহন মঞ্চে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ শাখা আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক গুরু বিশ্বাস এবং সভাপতি ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন উত্তর কলকাতা শাখার সভাপতি দেবাশিস লাহিড়ী।

ভারতমাতার ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর সাহিত্যিক গুরু বিশ্বাস তাঁর ভাষণে বলেন, স্বাধীনতার পর যাঁদের ওপর দায়িত্ব ছিল ভারতবর্ষ গড়ে তোলার, তাঁরা দেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতেন না। তাই আজ ভারতে অপসংস্কৃতি দেখা যাচ্ছে। স্বাধীন ভারতের উচিত ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জন করা, ভারতের সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কাজ করে চলেছে সংস্কার ভারতী। আমাদের ব্রত হোক আগামী প্রজন্মকে সাংস্কৃতিকভাবে গড়ে তোলা।

নীলাঞ্জনা রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভারতের একটি বৈশিষ্ট্য মাতৃবন্দনা। নতুন প্রজন্ম এই ঐতিহ্যকে ভুলে যাচ্ছে। তারা জানে না পুজোগুলি সমাজের সংস্কৃতির প্রতিফলক। মাতৃভাবে দেবীবন্দনা ভারতেই দেখা যায়। ভারতে একটি শিশুকন্যাকেও আমরা মা বলে সম্বোধন করি। শালীনতা, সম্ভ্রম বজায় রেখে সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। এই লক্ষ্য রেখেই সংস্কার ভারতী সারা ভারতব্যাপী কাজ করে চলেছে। বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষে সংস্কার ভারতী ভবিষ্যতে একটি শিশুকিশোর নাট্যমেলার অনুষ্ঠান করবে।

এরপর অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সংস্কার-ভারতীর উত্তর কলকাতা শাখা একটি নাট্যগীতি আলেখ্য নিবেদন করেন। এই আলেখ্যতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান এবং বিবেকানন্দ রচিত ভজন পরিবেশন করা হয়। গানের মাঝে মাঝে ছিল ছোট ছোট শ্রুতিনাটক, যার বিষয় ছিল মা ও পুত্রের কথোপকথন। এর মধ্যে প্রথমে পাঠ করা হয় সর্বজনবিদিত 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'। এরপর ছিল 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অংশ বিশেষ, সেখানে চন্দ্রগুপ্ত রণক্ষেত্র থেকে নন্দের ভয়ে পালিয়ে আসায় গুরুদেব চাণক্য তাঁর মা-কে চন্দ্রগুপ্তকে আবার রণক্ষেত্রে পাঠাতে বলেন। এই প্রেক্ষিতে মা-র সঙ্গে

চন্দ্রগুপ্তের কথোপকথন। তৃতীয় শ্রুতিনাটক ছিল অমিত দে রচিত, 'জুড়াইতে চাই'। এখানে বিষয় সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে চেয়ে মার সঙ্গে বিবেকানন্দের কথোপকথন। সমগ্র আলেখ্যটির পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় ছিলেন অমিত দে। গীতি আলেখ্যর পর সাগরিকা মুখোপাধ্যায় এবং তুলিকা হালদার নৃত্য পরিবেশন করেন।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল সংস্কার ভারতী নাট্যবিভাগের নিবেদন, ছোট নাটক— 'ঠিকানা ভারতবর্ষ'।

সমরেশ মজুমদারের উপন্যাসের অবলম্বনে করা এই নাটকের পটভূমি উত্তরবঙ্গের কোনও এক গ্রাম। দিশা ডাক্তারি পাশের পর এই গ্রামেই পোস্টেড হয়েছে। তার নিজের বাবা-মার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও স্বামী সূর্য এবং শাশুড়ীর সমর্থনে সে এই চাকরিতে যোগদান করেছে। গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিকাঠামোর অভাব সত্ত্বেও সততা এবং মানবিকতার সঙ্গে কাজ করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে দিশা। এরই মধ্যে এক বর্ষার রাতে গুলিতে আহত এক চরমপন্থী যুবককে তার দুই সঙ্গী দিশার কাছে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। প্রথমে রাজি না হলেও পরে সে যুবকটিকে চিকিৎসা করে। পরদিন সকালে দেখা যায় যুবক তিনটি পালিয়ে গিয়েছে। এর পরিণামে দিশাকে সাসপেন্ড করা হয়। এরই মধ্যে দিশার স্বামী এবং শাশুড়ি তার গ্রামের বাড়িতে আসেন। সেখানে তাদের সঙ্গে আলাপ হয় দিশার বান্ধবী স্কুলশিক্ষিকা সুচেতনার সঙ্গে। তার কাছ থেকে ওঁরা জানতে পারেন সরকারি বঞ্চনার কারণে গ্রামের মানুষের কি দুরবস্থা, আর সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করতেই চরমপন্থা বেছে নিয়েছে গ্রামের একদল যুবক। এরপরই রাতের অন্ধকারে ওই তিন যুবক দিশার বাড়িতে আসে তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য। কিন্তু চরমপন্থাকে মেনে না নিতে পারা দিশা তাদের ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু কৃতজ্ঞতাবশত ওরা প্রচুর ওষুধপত্র রেখে যায় দিশার বাড়িতে তার অজান্তেই। এই সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরই কর্মী মাধববাবুর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাকে দিশার বাড়িতে নিয়ে আসেন। মহিলার চিকিৎসার জন্য ওষুধের প্রয়োজন। সেই ওষুধ পাওয়া যায় যুবকগুলির রেখে যাওয়া ওষুধের বাক্সে। দিশা প্রথমে রাজি হয় না ওই ওষুধে হাত দিতে। কিন্তু সূর্য যখন প্রশ্ন করে, আইন আগে না মানবিকতা আগে তখন মানবিকতারই জয় হয়। দিশা মহিলাকে ওষুধ প্রয়োগ করে এবং একটি সুস্থ শিশুর জন্ম হয়। শিশুটিকে কোলে নিয়ে দিশা বলে, হয়তো এই শিশুরাই আগামী ভারতবর্ষের ঠিকানা।

নাটক রচনা এবং পরিচালনায় বিকাশ ভট্টাচার্য তাঁর দক্ষতা এবং বিদগ্ধতার পরিচয় রেখেছেন। বিভিন্ন সংলাপে উঠে এসেছে বর্তমানে গ্রামের বঞ্চিত অসহায় মানুষদের কথা।

দিশার চরিত্রে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সুঅভিনয় করেছেন সুব্রতা হালদার। এছাড়া মাধববাবুর চরিত্রে সুকুমার পতি, শাশুড়ী—সান্ত্বনা চ্যাটার্জি, সুচেতনা—শ্রাবণী হালদার, ওসি—প্রদীপ দাস নজর কেড়েছেন।

মদন— টিঙ্কু নির্মিত সেট খুব সুন্দর, আর ভালো লাগে মুরারী রায়চৌধুরীর করা আবহ সঙ্গীত। উত্তম বিশ্বাসের লাইট এবং মহম্মদ ইব্রাহিমের রূপসজ্জা যথোপযুক্ত। সব মিলিয়ে 'ঠিকানা ভারতবর্ষ' একটি মনোজ্ঞ নাটক।

শব্দরূপ-৬৫১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

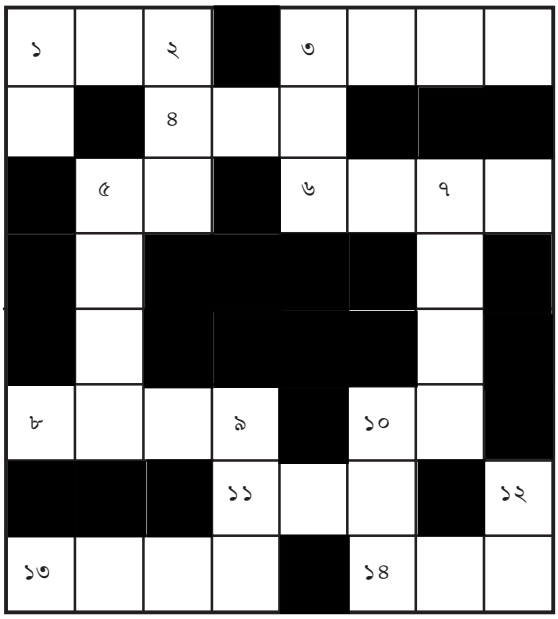

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. ব্যোমচারী; পক্ষী; জনৈক মুনি; প্রথম অক্ষরে আকাশ, **৩.** মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা, **৪.** শিব, **৫.** গোয়ালা, **৬.** লক্ষবার অগ্নিতে দগ্ধ করে যার বিশুদ্ধি সাধন করা হয়েছে; পদাবলী সাহিত্যে স্বর্গের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত, **৮.** মহাধনী; শ্রীমন্তের পিতা; কুবের, **১০.** বধির শ্রীকৃষ্ণ, **১১.** বাচালতা, পাকামি, **১৩.** পুরাণোক্ত পাতাল বিশেষ, **১৪.** তৃণধান্য।

উপর-নীচ : ১. কপট, ক্রূর; ঔষধি মাড়িবার পাত্র, **২.** ভ্রমর, **৩.** রাধিকার শাশুড়ী, **৫.** বৃন্দাবনের পর্বত বিশেষ যা শ্রীকৃষ্ণ তুলে ধরেছিলেন, **৭.** সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের যে অংশ যাত্রা ইত্যাদিতে বর্জনীয়, **৯.** পাকাপাত্র; চেপটা হাঁড়ি, **১০.** রমণী, সাদা সুগন্ধি ফুল, **১২.** "বল—, বল উন্নত মম শির"।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৪৮
সঠিক উত্তরদাতা

রুদ্র কর
পানিহাটি,
উত্তর চব্বিশ পরগণা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৬৫১ সংখ্যার সমাধান আগামী ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
"চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক—রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আজ রীণা দেবী। *উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা—
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ২৩

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমে বার্ষিক উৎসব

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বনবাসীরা সামাজিক ও ধর্মীয় শোষণের শিকার

চিন্ময়ী রায়॥ রামায়ণে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ১৪ বছর বনবাসকালে বনবাসী মহিলা শবরীদেবী (শবরী মাতা)-র পর্ণকুটিরে তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। পৌরাণিক এই ঘটনা ভারতীয় সংস্কৃতিতে বনবাসী ও নগরবাসী জীবনের মধ্যে একাত্মতা নির্মাণের নিদর্শন প্রস্ফুটিত হয়। নগর সমাজ ও বনবাসী সমাজকে একসূত্রে বাঁধার প্রয়াস করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। ভারতের সেই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে বনবাসী সমাজের উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট হয়েছে অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। পশ্চিমবঙ্গে যা পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম নামে পরিচিত। বনাঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয় বনবাসী ভাই-বোনেদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রয়াসে উদ্যোগী কল্যাণ আশ্রম দেখতে দেখতে তার ৬০ বছরের যাত্রা সম্পন্ন করেছে। এই কাজে পিছিয়ে নেই কলকাতা মহানগরও। গত ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার কলামন্দিরে আয়োজিত ৩৩তম বাৎসরিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তার ভাষণের মধ্য দিয়ে এই কথাগুলিই উঠে এল।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও শিক্ষাপ্রেমী বিনোদ কাঙ্কারিয়া, প্রধান অতিথি শিল্পপতি ও সমাজসেবী সন্তোষজী সরাফ। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন থম্বুই জেলিয়াং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ আশ্রমের হাওড়ার শাখার সভাপতি শঙ্করলাল হাকিম, কলকাতা শাখার সভাপতি জিতেন চৌধুরী, কলকাতার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সন্দীপ চৌধুরীসহ কল্যাণ আশ্রমের অন্যতম মহিলা কর্মকর্তা শ্রীমতি শকুন্তলা বাউড়ি।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা শ্রীমতি স্নেহলতা বৈদ্যের সঞ্চালনায় ওঁকার মন্ত্র পাঠ ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি সম্প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে কল্যাণ আশ্রম দ্বারা আয়োজিত চিকিৎসা শিবিরের সহযোগী দুই চিকিৎসক ডঃ প্রতীম দাশগুপ্ত ও ডঃ সিটু দে-কে তিলক, পুষ্পস্তবক এবং শ্রীরাম ও হনুমানজীর আলিঙ্গনবদ্ধ ছবি প্রদানের মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা তথা বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের গোরক্ষপুর ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র থম্বুই জেলিয়াং তাঁর আশ্রম জীবন ও নাগাল্যাণ্ডের বর্তমান অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের বনবাসীরা কিভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় শোষণের শিকার হচ্ছে তার বর্ণনা দেন। সেইসঙ্গে কল্যাণ আশ্রম ও সঙ্ঘ পরিবারের প্রয়াসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামাজিক উত্থান ও তাদের কার্যপ্রণালী তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে কল্যাণ আশ্রম পরিচালিত একল বিদ্যালয়ের বনবাসী ছাত্রদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা হয়। বনবাসী গ্রামবাংলার প্রসিদ্ধ ছৌ-নাচের মাধ্যমে মহিষাসুরমর্দিনী অভিনয় প্রদর্শনের পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
24 December - 2012

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

দাম : ৭.০০ টাকা